কামিনী কুসুম

মীরা রায়

রায় ব্রাদার্স
১৭২এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা—২৬

প্রকাশক—শ্রীসমরজিৎ লাল রায়
রায় ব্রাদার্স
১৭২এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা—২৬

মুদ্রাকর—শ্রীজিতেন্দ্র নাথ সেন
ইউনিয়ন প্রেস
১০, ওয়াটারলু ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১

প্রচ্ছদপট শিল্পী
শ্রীভূনাথ মুখার্জ্জি

প্রথম সংস্করণ
রথযাত্রা
২৫শে আষাঢ়
১৩৬৩

দুই টাকা
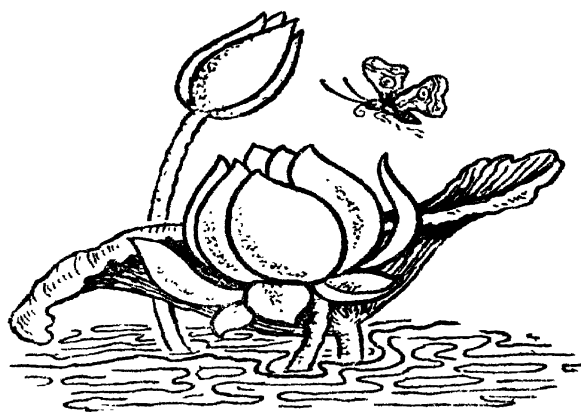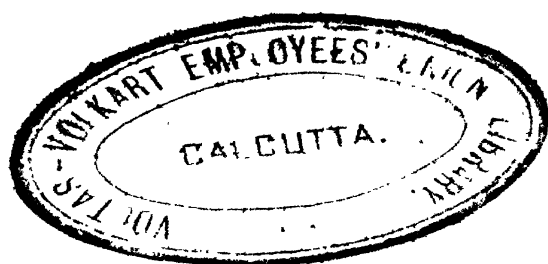
উৎসর্গ

দিদিমাকে—

কামিনী কুসুম

এক

"উঃ, মাগো, আমি যে আর চলতে পারছিনে তরুর মা।"

"না এগুলে চলবে কি করে বাছা—" বলেই তরুর মা অসহায় হ'য়ে চার দিকে ভীত-সন্ত্রস্ত ভাবে তাকায়। কী যেন একটা বিপদের আশঙ্কায় তার সমস্ত দেহ কাঁপতে থাকে। চঞ্চল হ'য়ে রাণীর একখানা হাত ধরে বললে, "আমাদের এখন এত ভেঙ্গে পড়লে চলবেনা। যখন সব বিপদের বোঝা মাথায় চেপে তোকে নিয়ে এই অন্ধকার রাতে পথে বেরিয়েছি তখন রাস্তার মাঝে থমকে দাঁড়ালে হবে কেন মা, জোর রাখতে হবে মনে,—ভগবানকে ডাক্—এ বিপদ থেকে যেন উদ্ধার করতে পারি তোকে।" তরুর মার কথায় রাণীর চোখে জল এসে যায়। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুক চিরে।

"ভগবান নেই তরুর মা, নইলে—" কথার পাহাড় এসে আটকে যায় রাণীর কণ্ঠে। দেবতার উপর তার অভিমান এইখানে

যে—'যার পাপের পথে মন যায়—নষ্ট দুষ্ট যে—তাকে তুমি যত পার সাজা দাও—, কিন্তু নিরীহকে নির্যাতন করেও তুমি দয়াময় নাম নেবে ?' তার ভাগ্যের জন্য সে নিজে কতটুকু দায়ী ? আর পাঁচজনের মত সেও মানুষের মত মানুষ হ'য়ে বাঁচতে চায়, এই কি তার অপরাধ ? যদি মানুষের মত তাকে বাঁচতে দেওয়াই না হয় তবে কেন তাকে এ পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখা ? ক্ষোভে ও অভিমানে রাণীর বুক ফেটে যেতে চায়।

"ও কি! ও কিসের শব্দ ?" বলেই তরুর মাকে রাস্তার মাঝে ভয়ে জড়িয়ে ধরে রাণী।

গভীর রাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়বার জো নেই। শুধু আকাশের তারাগুলো মিট্ মিট্ ক'রে জ্বলছে। থেকে থেকে শেয়ালের ডাক্ আর আশে-পাশের গাছ থেকে নিশাচর পাখীদের বিকট আওয়াজ ও ডানার ঝাপটানি সেই গভীর নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করছে ।

দূরে মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে ভয়ে দিশেহারা হ'য়ে, রাণীকে বুকের কাছে টেনে নেয় তরুর মা । চুপি চুপি তাকে বলে, "ওরে রাণী, দেরী করিসনে—শীগ্‌গির চল।"

"কিন্তু ওরা যদি আমায় ধরে ফেলে" আতঙ্কে বলে ওঠে রাণী।

"কিছুতেই পারবেনা" ব'লে তরুর মা রাণীকে একরকম টেনেই অন্ধকারে বনজঙ্গল পেরিয়ে ছুটতে থাকে। 'রক্ষাকর—এ বিপদ হ'তে রক্ষাকর. মধুসূদন!' "চল্ চল্ রাণী, তাড়াতাড়ি পা বাড়িয়ে চল্।"

ছুটতে লাগলো রাণী উন্মাদের মত তরুর মার হাত শক্ত ক'রে ধ'রে। কিছুটা এগিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে রাণী, "কি

অন্ধকার তরুর মা, আমার যে বড্ড ভয় করছে, সমস্ত শরীর কাঁপছে—চোখে অন্ধকার দেখছি, কি করে পথ চলবো—যদি একটু আলো—"

রাণীর হাত ধরে ছুটতে ছুটতে তরুর মা বলে "ওরে, না—না—অন্ধকারই যে ভাল,—কে বলে ভগবান নেই! আজ যদি জ্যোৎস্না রাত হ'ত, তা হ'লে যে আমরা কখন ওদের হাতে ধরা পড়তাম। অন্ধকার বলেই তো লুকিয়ে পথ চলতে পারছি। ও কি? পড়ে গেলি মা? ওঠ, ওঠ, আর ভয় নেই। আমরা বোধ হয় বিপদের জায়গা পেরিয়ে এসেছি। ওকি! সাড়া দিচ্ছিস্‌না কেন?"

তরুর মা ব্যস্ত হ'য়ে অন্ধকারের মধ্যে হাত্‌ড়ে রাণীর মাথা কোলে তুলে নিয়ে অস্থির হ'য়ে ডাকতে লাগলো, "রাণী, মা আমার! কোন সাড়াই যে দিচ্ছেনা—আমি কি করবো এখন, ভগবান একি করলে তুমি!"

দুর্ভাবনা তার আরও বেশী—যেহেতু এ মেয়েটি কোনদিন পথে বেরোয়নি। তার ওপর সারাদিন উপোস। মধুসূদনের কাছে তাই তার একান্ত মিনতি, "বিপদের উপর বিপদ দিওনা প্রভু!"

এমন সময় রাস্তার কিছু দূরে একটা আব্‌ছা আলো দেখতে পেল—সে। আলোটা তাদের দিকে যেন এগিয়ে আস্‌ছে। ভয়ে উদ্বেগে এবার তরুর মা সত্যিই ভেঙ্গে পড়লো। কে আসছে তাদের অনুসরণ করে? তবে কি যাদের ভয়ে আজ রাণীকে নিয়ে বেরিয়েছে পথে, তারাই সন্ধান পেয়ে—" আর ভাববার সময় পেলনা তরুর মা। মুহূর্তের মধ্যে একটা ঘোড়ার গাড়ী ওদের সামনে এসে থম্‌কে দাঁড়াল। লণ্ঠনের আলোতে, গাড়োয়ান এত রাত্রে দুজন মেয়েমানুষকে রাস্তার মাঝে পড়ে থাকতে দেখে, গাড়ী থামিয়েছে। গাড়ীর ভিতর ছিল দুজন যুবক ও একজন মহিলা। হঠাৎ মাঝপথে গাড়ীর গতি

থেমে যাওয়াতে গাড়ীর ভেতর থেকে উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠের সাড়া এল—"কি হ'লো গাড়োয়ান—মাঝপথে গাড়ী থামালে যে ?"

গাড়ীর ভেতর যে মহিলাটি ছিল, তার বয়স বছর পঁচিশ হবে। সুন্দর দোহারা চেহারা, সর্বাঙ্গ যেন লাবণ্যে ভরা। গা ভর্তি গয়না, বেশ পরিপাটী তার সাজসজ্জা।

সহযাত্রী যুবক দুইটির একজন হচ্ছে তার স্বামী প্রণব, অপরজনের নাম আশীষ। হঠাৎ মাঠের মাঝখানে গাড়ী থামাতে বীণা যে রীতিমত ভয় পেয়েছে তা তার চোখে মুখে ফুটে উঠ্‌লো। আশীষ সেটা উপভোগ করেই বল্‌লো, "কি, ভয় পেয়েছো তো ? আচ্ছা, এই পালোয়ান সঙ্গে থাকতেও তোমার এত ভয় বৌদি ?"

"না, না, কিন্তু—ওকি ? কে কাঁদছে ? মেয়েমানুষের গলা যেন ?"—ভয়ে বীণা স্বামীর গা ঘেঁসে বসে কাঁপতে থাকে। ওরা দুজন গাড়ী থেকে গলা বাড়িয়ে বললে, "কে—কে কাঁদে গাড়োয়ান ?" গাড়োয়ান কোচের উপর থেকে দুম্ করে মাটিতে নেমে পড়ে বললে, "বেড়িয়ে আসুন বাবুরা, দুজন মেয়েমানুষ।"

গাড়োয়ানের কথায় আশীষ পাদানীতে পা না দিয়ে লাফিয়ে পড়েই গাড়োয়ানের পথ অনুসরণ করলে। প্রণবও যাবার জন্যে পা বাড়ালে, কিন্তু পেছন থেকে প্রণবের জামা টেনে ধরলে বীণা। ভীতস্বরে বললে, "তুমি যেওনা, আমার একা থাকতে ভয় করেনা বুঝি ?" আশীষ আসার সঙ্গে সঙ্গে তরুর মা যেন কেমন হয়ে গেল। হঠাৎ আশীষের পা জড়িয়ে ধরে বললে, "তোরা কে জানিনে, যেই হোস্—রক্ষা কর্—রক্ষা কর্ আমার রাণীকে।" হতভম্ব হয়ে আশীষ তাকায় রাণীর দিকে। তাকিয়েই চমকে উঠলো সে। লণ্ঠনের আলোতে দেখলে একটি মেয়ে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে আছে মাটীর উপর। পরিধানে তার লাল বেনারসী শাড়ী, মাথায় জড়িপাড় লাল ওড়না, সিঁথিতে

সোনার টিক্‌লি, গলায় ফুলের মালা, কপালে বড় করে চন্দনের টিপ, দুখানি পায়ে আল্‌তা পড়া।

তন্ময় হয়ে রাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল আশীষ। হঠাৎ প্রণবের ডাকে চমক ভাঙ্গে আশীষের। একটু বুঝি লজ্জিতও হয়। তাড়াতাড়ি গাড়ীর কাছে এসে প্রণবকে বললে, "শীগগীর এসো বৌদিকে নিয়ে। একজন ভদ্রমহিলা মূর্চ্ছিতা হয়ে রাস্তায় প'ড়ে আছেন।"

"ভদ্র মহিলা!" বিস্ময়ের সুরে বললে বীণা।

"হ্যাঁ বৌদি—শুধু ভদ্রমহিলা নয়, বেশভূষা দেখে মনে হলো কনের সাজ?"

"কনের সাজ !!" ততোধিক বিস্মিত হয়ে বলে বীণা।

দ্রুতপদে তিনজনেই এসে দাঁড়াল রাণীর মূর্চ্ছিত দেহটিকে ঘিরে। আগেই আশীষ গাড়োয়ানের হাত থেকে আলোটা নিয়ে রাণীর পাশে রেখে গিয়েছিল। প্রণব ও বীণা তার দিকে তাকিয়ে আশীষের মতো চম্‌কে উঠল। হঠাৎ বীণার মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে বেড়িয়ে এলো "এমন লক্ষ্মী প্রতিমা! এ বেশে, এ অবস্থায়, এখানে?"—বলে উদ্‌বিগ্ন হয়ে তাকায় তরুর মার মুখের দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ে রাণীর মাথার কাছে।

বীণার প্রশ্নে তরুর মার কান্না উপ্‌চে পড়ে। উন্মাদের মতো বীণার দুখানা হাত চেপে ধ'রে বললে, "মা, ওকে আগে দ্যাখ্‌ বেঁচে আছে কিনা? ভগবান তোদের পাঠিয়েছেন এ সময় —এখানে ওকে রক্ষা করতে।"

বৃদ্ধার হাত সড়িয়ে দিয়ে বীণা রাণীর মূর্চ্ছিত দেহখানা ধ'রে একটু নেড়ে দেখে বিচলিত হ'য়ে স্বামীকে বললে, "ওগো, দেখনা বেঁচে আছে কি না? তুমি তো ডাক্তার, পারবে না ওকে বাঁচাতে?"

প্রণব এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রাণীকেই নিরীক্ষণ করছিল। বীণা ও তরুর মার কাতর উক্তিতে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না সে। রাণীর মূর্ছিত দেহটার কাছে বসে পড়ে রাণীকে পরীক্ষা করে দেখলে। আশীষের দিকে তাকিয়ে বললে, "ইনি মূর্চ্ছা গেছেন আশীষ, এখন কি করা যায় বলতো?"

উভয়ের দিকে তাকিয়ে বললে বীণা "ওঁকে আমাদের বাসায় নিয়ে গেলে হয় না?"

গম্ভীর হয়ে প্রণব বলে, "সে তো আমিও ভাবছি বীণা, কিন্তু—"

"কিন্তু কি? কি ভাবছ তুমি এ সময়?"

সত্যি কথা বলতে প্রণব একটু ইতস্ততঃ করে। চেয়ে থাকে বীণা প্রণবের মুখের দিকে—বিরক্ত হয়ে বললে—"কি বলছো তুমি?"

আমতা আমতা করে বললে প্রণব, "বলছিলাম কি, মাকে তো চেন, তিনি যদি হঠাৎ এ অবস্থায় এঁকে বাসায় দেখতে পান তাহ'লে যদি কোনো—"

স্বামীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বীণা বলে, "তুমি মার কথা ভাবছো? তা তিনি যাই বলুন না কেন, তাঁর স্বভাব তো আমাদের জানাই আছে। কোন প্রতিবাদ না করলেই তো হয়। বাসায় না নিয়ে এই অন্ধকার রাতে রাস্তার মাঝে তোমরা এঁদের ফেলে চলে যাবে? তা হবেনা। চলো আর দেরী করো না। এর পর হয়তো আমরা ওকে বাঁচাতে পারবো না।"

বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে প্রণব। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বললে, "আচ্ছা মা, আপনাদের বাড়ী কোন গাঁয়ে বলুন তো, গাড়ী করে আপনাদের বাড়ী পৌছে দেব!" অসহায়

ভাবে তাকায় বৃদ্ধা প্রণবের দিকে। কাতর কণ্ঠে বললে, "বাড়ী ফেরবার পথ আর নেই বাবা।"

ওরা অবাক হ'য়ে তিনজনের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে। প্রণব বললে, "এখন কি করবো আশীষ ?"

"কি করবো তাতো আমিও বুঝতে পারছিনে।'

"নিশ্চয় এর মধ্যে কোনো একটা রহস্য আছে, যার জন্যে উনি এঁকে বাড়ী নিয়ে যেতে চান না,"—ওদের কথার মাঝে বলে উঠল বীণা।

"ঠিক মা, ঠিক বুঝেচিস তুই। মেয়েরা মেয়েদের দুঃখ যেমন বোঝে, ছেলেরা কি তাই পারে ?" বলে তরুর মা।

এবার বেশ বিচলিত হয়ে বলল বীণা, "আর দেরী করো না তোমরা।" বলেই প্রণবের দিকে একবার তাকিয়ে আবার বললে, "আমি জানি, তুমি যার জন্যে পিছু হটছো,—তোমার কোনো চিন্তার কারণ নেই। আমি মাকে বুঝিয়ে বলার ভার নিলুম। চলো এবার একে নিয়ে।" বলেই বীণা মূর্চ্ছিত দেহখানা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে বৃদ্ধার সাহায্যে গাড়ীতে তুললে।

প্রণব ও আশীষ বীণার কথায় আর কোন প্রতিবাদ না ক'রে নিঃশব্দে এদের পথ অনুসরণ করলে। আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে ঘড়্ ঘড়্ আওয়াজে নিশীথ নিস্তব্ধতা চূড়মার করে দিয়ে গাড়ীখানা দ্রুত বেগে চলতে লাগলো।

দুই

হুগলী জেলায় কোন একটা গ্রামে গঙ্গার ধারে প্রণবের বাড়ী। ছোট্ট একতালা বাড়ীখানা। মাঝারি রকমের তিনখানা ঘর। সামনে বেশ বড় উঠান। উঠান পেরিয়ে দক্ষিণ কোণে ছোট্ট একটি তরকারি ও ফুলের বাগান। বাড়ীখানার চারিদিক বেশ খোলা-মেলা। ঐ রাস্তায় পায়ে হেঁটে সহরে যেতে বেশী সময়ের দরকার হয় না। এই সহরের এক পাশে—প্রণবের ছোট্ট একটী ডিস্‌পেন্‌সারী। ডাক্তারীতে তার বেশ হাঁকডাক আছে। প্রণব যা পায় তা দিয়ে তার ছোট্ট সংসারটি বেশ স্বচ্ছন্দেই চলে যায়। অভাবের কোন তাড়নাই নেই। বাড়ীতে মোটে তিনটী প্রাণী। প্রণব প্রণবের স্ত্রী বীণা ও প্রণবের বৃদ্ধা মাতা বিন্দি ঠাকুরাণী। মার বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। কিন্তু এখনও বেশ শক্ত, মোটা-সোটা 'জাব্দা' দেহখানি। বিন্দিঠাকুরাণীর স্বভাবটী ছিল একটু ঝগড়াটে। তুনিয়ায় কাউকেই তিনি সুনজরে দেখেননি কোনোকালেই। একমাত্র পুত্রবধু বীণাকেও যে সুনজরে দেখেছিলেন, এমন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণে অকারণে বিন্দিঠাকুরাণীর কাছ থেকে সর্বদাই গঞ্জনা পেতে হ'ত বীণাকে। তু'মাস আগে, যেদিন রাণীর বিপদ দেখে তাকে বুকে করে বাড়ী এনে আশ্রয় দিয়েছিল, সেইদিন থেকে বিন্দিঠাকুরাণী বীণাকে আরও বিষ নজরে দেখতে লাগলেন। সেদিন বীণা নিস্তব্ধ দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পাট মিটিয়ে সবে বিশ্রামের জন্য ঘরে গেছে, এমন সময় হঠাৎ বীণাকে উদ্দেশ্য করে বললেন বিন্দিঠাকুরাণী, "বলি হ্যাঁগা বৌমা, ওরা আর কতদিন বসে বসে আমার অন্ন ধ্বংস করবে শুনি! যাবার নামটি পর্যন্ত নেই। কে

এরা, আজ পর্যন্তও আমি ঠিক করতে পারলুম না বাছা। এই টানাটানির বাজারে একটা নয় দু দু'টো হতভাগীকে খাইয়ে পড়িয়ে পোষা কি সোজা কথা বাপু! বলি, ওরা তোমার কে বলতে পার?" এই বলে জবাবের আশায় বিন্দিঠাকুরাণী কটাক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন বীণার দিকে।

নম্রস্বরে বললে বীণা, "মা আমি তো সেদিনই বলেছি এরা আমাদের আশ্রিতা।"

"আ—শ্রি—তা!!" মুখ ভেংচিয়ে বলেন তিনি, "কার হুকুমে তুই ওদের আশ্রয় দিয়েছিস্ লা!"

"মা!" কাতরভাবে বললে বীণা, "আমার অপরাধ হয়েছে, এজন্যেতো আমি আপনার কাছে ক্ষমাও চেয়েছি।"

"ক্ষ্যামা চেয়েছি!!" মুখ বিকৃত করে বলে উঠলেন বিন্দি-ঠাকুরাণী, "ন্যাকাও বেশ সাজতে পারিস্ বাছা, বলি আমি বেঁচে থাকতে কিনা তুই হবি বাড়ীর কর্ত্রী! জানা নেই, শোনা নেই, বলা নেই, কওয়া নেই কোত্থেকে দু দু'টো মেয়েমানুষকে রাত দুপুরে বাড়ীতে এনে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। আবার বলে কিনা আশ্রিতা! বলি এ বুদ্ধিটুকুও কি তোর মগজে ঢোকেনি যে, ঐ আইবুড়ো মেয়েকে সমাজে কেন স্থান দেয়না? ওরা জাতনাশা মেয়ে, ওদের কী—"

"আঃ, মা! চুপ করুন শুনতে পাবে যে।" ভয়ে ভয়ে বলে উঠল বীণা।

"শুনুক—তাতে আমার কি লা? আমি কারো খাই—না পরি যে ভয় করতে যাবো! আঁস্তাকুড়ের জঞ্জালকে আশ্রয় দেবার আর জায়গা পেলে না, মরতে এলো কিনা আমার বাড়ীতে।"

মর্মাহত হ'য়ে বীণা তাকায় বিন্দিঠাকুরাণীর মুখের দিকে।

একটু পরে করুণভাবে বললে, "কাকে বলছেন আপনি একথা? ও যে খুব লক্ষ্মী মেয়ে মা!"

"তুই তো সবই জানিস্!" দেহখানা দুলিয়ে বিদ্রূপের কণ্ঠে বললেন তিনি।

ধীরে ধীরে বললে বীণা, "ও সত্যিই নিষ্পাপ। মা, সত্যিই ও বড় অভাগী, আমার কথা বিশ্বাস করুন। আপনার দু'টি পায়ে পড়ছি—ওদের আর অপমান করবেন না। ওরা সত্যি বিপদে পড়েই—"

"বলি জগতে কে কার বিপদ দেখে লা? তোর বাপের কথাই ধর্না কেন, এইত সেবার মরতে বসেছিলি, কই—একবারটি কি বুড়ো তোকে চোখের দেখা দেখতে এলো? বাপ বলতে তো অজ্ঞান। কতই না খোঁজ নিলে মেয়ের বিপদের সময়!"

"ওসব পুরোণো কথা আজ কেন মা! তখন অসুস্থ ছিলেন তিনি।"

"হুঁ, তা বটে, যতসব বানানো কথা।" বলেই রাগে দুম্ দাম্ ক'রে পা ফেলে চলে গেলেন তাঁর ঘরে।

মনে মনে বলতে থাকে বীণা, 'হ্যাঁ, বানানো কথাই বটে।' বাবার কথা মনে হ'তেই বীণার চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে। তখন বীণার অসুখ সেরে গেছে, এর মধ্যে খবর এলো তার বাবা মনোমোহন বাবু খুব পীড়িত হ'য়ে পড়েছেন। একটিবার মাতৃহারা একমাত্র মেয়ে বীণাকে দেখতে চান। খবর পেয়ে বীণা বাবাকে দেখবার জন্যে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। তখন প্রণব ছিলনা বাড়ীতে। সে গিয়েছিল পাবনায় একটা জরুরী কাজে। কাজেই বীণা বিন্দিঠাকুরাণীকে জানালে বাবার অসুস্থতার খবর। সুযোগ বুঝে সেদিন প্রতিশোধ নিলেন বিন্দিঠাকুরাণী, বললেন, "কেন দেবো যেতে, ও বুড়ো কি মেয়েকে একবার দেখতে এসেছিল?"

সেদিন শুধু বীণা নীরবে কেঁদে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল নিজেকে। সে কথা মনে হ'লে আজও বীণার চোখে হুহু করে বন্যার মতো জল এসে যায়। কিন্তু এর জন্যে সে কোনোদিন আর বিন্দি ঠাকুরাণীকে রূঢ় কথা শোনায়নি বা দোষারোপ করেনি। শুধু দোষ দিয়েছে তার অদৃষ্টকে। এমনি সহ্যশীলা ও চাপা মেয়ে বীণা।

"বৌদি!"

বীণা চোখের জল সম্বরণ ক'রে রাণীর দিকে তাকিয়ে বললে, "কিরে কিছু বলবি?"

"আমি পাশের ঘর থেকে সব শুনেছি বৌদি। সত্যি বৌদি, তুমি আমাদের জন্যে মাসীমার কাছে কতই না লাঞ্ছনা পাও। এইভাবে নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করে কতদিন আর আমাদের দুঃখের বোঝা বইবে তুমি! জানি কপাল আমার ভেঙ্গেছে অনেকদিন। তাই বলছি আমাদের ছেড়ে দাও। যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব। ভাগ্যে যা লেখা আছে, তাই হবে। আমি যে তোমার অপমান আর সহ্য করতে পারছিনে।" বলতে বলতে একটা গভীর দুঃখ তার মনের মাঝে সঞ্চিত হয়ে ওঠে।

রাণীর বেদনাভরা কথাগুলো শুনে বীণার বুকখানা বেদনায় টন্‌টন্ করে উঠলো। আস্তে আস্তে বললে বীণা, "মার কথা ছেড়ে দে বোন, ও আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু তোদের কষ্ট যে আমি সইতে পারিনে। কোথায় তোরা যাবি—কে তোদের আশ্রয় দেবে?" বলেই দু'হাতে তার মুখখানা তুলে ধরে বীণা, —আবার বলে "কি দুঃখের কপাল নিয়েই তুই জন্মেছিস্ বোন। যাক্ তুই মার কথাতে কিছু মনে করিস্‌নে। উনি যাই বলুন না কেন আমি তোদের ছেড়ে দিতে কখনও পারব না।"

ভারী ভারী জুতোর আওয়াজ শোনা গেল উঠোনে। দুজনকেই

কথার মাঝে থম্‌কে দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলে প্রণব। অভ্যস্ত সুরে বললো, "আমায় এক গ্লাস জল খাওয়াবে, রাণী?" এই তিন মাসে প্রণব রাণীকে বাড়ীতে এনে শুধু আশ্রয়ই দেয়নি, দিয়েছে তাকে ছোটো বোনের মর্যাদা। তাই এখানে এসে কিছুদিনের মধ্যে রাণী বেশ ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল প্রণব আর বীণার কাছে। প্রণবের বোন ছিল না—কিন্তু রাণীকে পেয়ে সে অভাব ভুলে গিয়েছিল প্রণব। সৎগুণ বলতে যা কিছু বোঝায়—তার সবই ছিল রাণীর মধ্যে। তাই প্রণব ও বীণা উভয়ে যেমন তাকে ভালোবাসতো তেমনি স্নেহও করত।

তাই যেদিন বিন্দিঠাকুরাণী রাণীকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করতেন, সেদিনই বিশেষতঃ প্রণব রাণীকে সামনে ডেকে সস্নেহে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলতো 'মার কথায় কিছু মনে করিস্‌নে বোন!' তাই আজও প্রণব ডিস্‌পেন্‌সারী থেকে ফিরে এসে বীণা ও রাণীর মুখের ভাব লক্ষ্য করে বুঝতে পারলো, রাণীকে নিয়ে একটা কিছু ঘটনা ঘটেছে তার মার সঙ্গে। তাই রাণীকে জল আনবার ছল ক'রে ভেতরে পাঠিয়ে বীণাকে জিজ্ঞেস করল, "মা বুঝি আজও আবার —" বলতেই জলের গ্লাসটি নিয়ে উপস্থিত হ'লো রাণী প্রণবের সামনে। বীণা জবাব দিলে, "সে আর নোতুন কি, রাণী কিন্তু এখানে আর থাকতে চায় না।"

"সে কী কথা বীণা?" ব'লে বেশ চিন্তিত হ'য়ে পড়ে প্রণব।

রাণীর হাত থেকে জলের গ্লাসটি তুলে নেয় সে। অপরাধীর মত মাথা নিচু করে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মেজেটা ঘস্‌তে থাকে রাণী। সস্নেহে রাণীর মাথায় আলতো ভাবে হাতখানি রেখে বললে প্রণব, "তোর এ দাদা বৌদি থাকতে কোনো ভাবনা নেই বোন।" বলতে বলতে ছোট্ট একটা কাপড়ের বাণ্ডিল রাণীর হাতে তুলে দিল

প্রণব। বাণ্ডিলটা হাতে নিয়ে রাণী জিজ্ঞাসা করে, "এর ভেতরে কী আছে দাদা ?'

"তোরই দুখানা শাড়ী।"

"আবার শাড়ী কেন ? এই তো সেদিন দুজোড়া শাড়ী আমার জন্যে কিনে আনলে।"

সস্মিত বদনে জবাব দিলো বীণা, "তাতে কি হয়েছে বোকা মেয়ে, তোর দাদা তোকে দিয়েছে। এতে এমন অপ্রস্তুত হবার কী আছে ?" প্রণব হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটু ব্যস্ততার সঙ্গে বললে, "আমায় এক কাপ চা খাওয়াবে রাণী ? এক্ষুনি আবার বের হ'তে হবে।"

"শুধু চা খাবে ? তিনটে প্রায় বাজে—জলখাবারটাও অমনি নিয়ে আসি ?"

"না—জলখাবার ফিরে এসে খাবো। শুধু চা দে।"

"আচ্ছা" বলে রাণী প্রণবের দেওয়া শাড়ী দুখানা হাতে করে বের হয়ে এলো প্রণবের ঘর থেকে। কিন্তু কিছুই এড়ালোনা বিন্দি ঠাকুরাণীর শ্যেণদৃষ্টি থেকে। রাণীর হাতে শাড়ী দু'খানা দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন তিনি। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল প্রণবের উপর। কি যেন একটা কাজের জন্য ঘর থেকে বের হয়েছিলেন বিন্দিঠাকুরাণী। সে কাজ ভুলে গিয়ে সোজা প্রণবের ঘরে ঢুকে বোমার মতো ফেটে পড়লেন "বলি প্রণব, তুই কী বাড়ীতে দানছত্র খুলে বসেছিস্ ?"

"দানছত্র!" সবিস্ময়ে তাকায় প্রণব মার দিকে।

"হ্যাঁ দানছত্র।" কঠিনতা ফুটে উঠল বিন্দিঠাকুরাণীর মুখে।

বুঝতে পারে প্রণব মায়ের কথার ইঙ্গিত। কিছুক্ষণ মৌন থেকে বেশ শান্ত ও নম্রভাবে উত্তর করলে, "তুমি কী রাণীর কথা বলছো মা ?"

"বলি, ও হতচ্ছাড়ীর কথা নয়তো কার কথা বলবো শুনি ?"

হঠাৎ মায়ের এরূপ উক্তির জন্য বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না প্রণব। তাই যেমনটি হ'লে ঠিক বিন্দিঠাকুরাণীর মুখের মতো জবাব হতো তা সে দিতে পারলো না। সেই অভ্যস্ত নম্রসুরে বললো, "সমস্ত জেনে শুনে যদি তুমি এমনভাবে কথা বল মা, তাহলে আমার আর বলবার কিছুই নেই।"

"তোর বলবার কিছু না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে। বলি, ওকে আশ্রয় দিয়েছিস,—দিয়েছিস,—আশ্রিতার মতোই নয় থাক্। কিন্তু একেবারে যে মাথায় তুলেছিস্।"

"মাথায় তোলবার কী দেখলে মা তুমি ?"

"বলি, নাইবা দেখবো কেন ? চোখের মাথা তো এখনও খাইনি। এই যে এখানে নিয়ে যাওয়া, ওখানে নিয়ে যাওয়া, দামী দামী শাড়ী এটা ওটা সেটা দেওয়া—এসব কি ? এটা কি বাড়াবাড়ি নয় ?"

মনে মনে যথেষ্ট বিরক্ত হ'লেও তাঁকে বোঝাবার জন্য ঠিক কি কথা বলা যায়, কি বললে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, অথচ মায়ের প্রতি তাকে রুক্ষ হতে হয় না—এই ভেবে নেওয়ার জন্য প্রণব যেই একটু সময় নিয়েছে, অমনি সেই অবসরে বিন্দিঠাকুরাণী আবার গর্জে উঠলেন, "মোট কথা আমি বলে দিচ্ছি, আশ্রিতা—আশ্রিতার মতো যদি থাকতে পারে তো থাকবে, নইলে আমার বাড়ীতে ওর স্থান হবে না"—বলেই তিনি যেমন ঝড়ের মতো এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলেন চোখের নিমেষে। বিমর্ষ হয়ে বসে থাকে প্রণব আর বীণা। তাদের খেয়ালই নেই কোন্ ফাঁকে আশীষ উঠান পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে—একেবারে দোরগোড়ায়। ঘরে ঢুকেই বাড়ীর আবহাওয়াটা কেমন যেন থম্‌থমে মনে হ'ল তার। নোতুন

সে আসেনি আজ এ বাড়িতে। এখানে থেকেই মানুষ হয়েছে সে—কাজেই এবাড়ীর নাড়ীনক্ষত্রের খবর তার নখদর্পণে।

আশীষকে দেখে বীণা একখানা চেয়ার দেখিয়ে বললে, "এসো ঠাকুরপো, বসো।"

ঘরের আবহাওয়াটা কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেও আশীষ চেয়ারে বসতে বসতে প্রশ্ন করলে, "ব্যাপার কী? তোমরা চুপ করে বসে আছ যে?"

"বড় মুস্কিলে পড়েছি ভাই।" ব'লে প্রণব অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা সামনের অ্যাসট্রেতে ফেলে দেয়।

"কেন?"

"আর বলিস্ নে। রাণীকে এখানে আশ্রয় দেওয়ার পর থেকে মা যা আরম্ভ করেছেন।"

"কেন, বৌদি কি বুঝিয়ে সুঝিয়ে পারলে না মাসীমাকে ঠিক করতে?"

"কই পারলুম ভাই," হতাশ হ'য়ে বললে বীণা, "মাকে বোঝায় এমন লোক জন্মায়নি পৃথিবীতে।"

'কিন্তু'—

"কিন্তুর কিছুই নেই ভাই! আমারই ভুল। আজ বারো বছরের মধ্যে যাঁর মুখে একটা মিষ্টি কথা শুনতে পাইনি, যার জন্যে রাতদিন আমায় তটস্থ হয়ে থাকতে হয়, সেই শাশুড়ী ঘরে থাকতে—আমার সেদিন এতবড় দুঃসাহস হ'লো কি করে, যখন একথা ভাবি, তখন আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই। এখন আমার রাতদিন মনে হচ্ছে—রাণীকে এখানে এনে আমি বোধ হয় ভাল করিনি।"

"ওটা তোমার ভুল ধারণা বৌদি। সেদিন ওরকম ভাবে জোর

করে তুমি ওকে এখানে নিয়ে না এলে ওর অবস্থাটা কী হতো একবার ভাবো দেখি ?"

"কিন্তু এখানেও তো ওর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"তা হোক্। তবু তো তোমাদের আশ্রয়ে আছে।"

"কিন্তু আমি যে পরাধীন। কতটুকু শান্তি ওকে দিতে পারি ? রাতদিন মেয়েটাকে বিনা কারণে কী লাঞ্ছনা কী গঞ্জনাই না সইতে হয়—।"

"এখন বুঝি তোমায় তাহলে রেহাই দিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ, দিয়েছেন বৈকি। আমার প্রাপ্য তো চিরকালই আছে। সেটা তো আমি ধর্তব্যের মধ্যেই আনি না—কিন্তু ওর অপমান ওর লাঞ্ছনা আর—"

"সত্যি, আশীষ, বড় মুস্কিলে পড়েছি ভাই। কেন যে মা এরকম করেন—বুঝতে পারিনে।" বলে প্রণব মার সেই কদর্য স্মৃতিতে ব্যথিত হয়। তারপর সে আবার বলে ওঠে "জানিস আশীষ, রাণীকে বাসায় এনে তরুর মার মুখে ওর জীবনের করুণ কাহিনী যেদিন শুনলাম, সেদিন থেকেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, ওকে ছোট বোনের মতো আমার কাছে রাখবো। তারপর ভালো একটি পাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে কর্তব্য শেষ করবো।"

"বেশ তো, তাই কর না কেন, প্রণবদা! ভালো একটি ছেলে দেখে ওর বিয়ে দিয়ে দাওনা। তাহ'লেই তো ঝঞ্ঝাট চুকে যায়।"

"তুই তো সোজা কথা বলে দিলি, আশীষ! কিন্তু বিয়েটা কি মুখের কথা ?"

"আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি তো মেসে থাকো, তোমার কি জানা শোনা ভাল পাত্র হাতে নেই ?"

একটু ভেবে আশীষ পরে বললে, "কই, তেমন তো কাউকে দেখিনে।"

হঠাৎ কী যেন ভেবে বীণার চোখ দুটি উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলে সে, "না দেখলে তো না দেখলে, তুমি তো আছ।"

কি কথা থেকে কি কথা এসে পড়লো। অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ে আশীষ। ভাবতে পারেনি প্রণবের সামনে এমনি করে তাকে উপলক্ষ্য ক'রে বলবে বীণা। বীণার কথায় আশীষ কেবল স্তব্ধই হ'লোনা, একেবারে লাল হয়ে উঠলো। কী যেন বলতে যাচ্ছিল সে বীণাকে, কিন্তু বলতে পারলোনা। দোরের সামনে রাণীকে দেখে মুখের কথা গুলিয়ে গেল তার। আশীষ আগেও যেমন এ বাড়ীতে আসা যাওয়া করত অবাধ ভাবে, এখনও ঠিক তেমনি ভাবে যখন তখন আসা যাওয়া করে। তার সঙ্গে রাণীর চোখের পরিচয় ছিল বটে, কিন্তু আলাপ ছিলনা। প্রণব কোনো জোর করেনি তাতে। কিন্তু আজ আর সে চা হাতে রাণীকে অন্য দিনের মতো দোরগোড়া থেকে ফিরে যেতে দিলে না। তার মনে হ'লো, আশীষের হাতে রাণীকে দিতে পারলে বেশ হয়। বীণার বুদ্ধির প্রশংসা মনে মনে না করে পারলনা প্রণব। বেশ উত্তর দিয়েছে সে। তাদের হাতে তৈরী ছেলে আশীষ,—চমৎকার ছেলে। দেখা যাক্ কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। প্রণব রাণীকে ডেকে বলল "ফিরে যাচ্ছিস কেন রাণী,—আয় না ঘরে। আশীষ এসেছে, তুই যেমন আমার বোন, আশীষও আমার তেমনি ভাই। ওর সামনে তোর লজ্জা কিসের? আয়, চা দিয়ে যা।"

লজ্জাবনত মুখে রাণী ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে চায়ের কাপটী প্রণবের সামনে এগিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

ওর লজ্জাবনত মুখখানার দিকে তাকিয়ে বললে বীণা, "আশীষকে এক কাপ চা এনে দে ভাই।"

আশীষ একবার বলতে যাচ্ছিল 'দরকার নেই। চা আমি খেয়ে এসেছি।' কিন্তু বলতে গিয়েও বলতে পারলোনা। কে জানে, বৌদির যা খোলা মুখ। হয়তো রাণীর সামনেই তাকে উদ্দেশ্য ক'রে আবার কতগুলো বেফাঁস কথা বলে বসবে। তার চাইতে চুপ করে থাকাই ভালো।

রাণী চলে গেল বীণার কথামতো আরেক কাপ চা আনতে। এমন সময় প্রণব চায়ের কাপটি নিঃশেষ করে হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, "তাহ'লে আমি আসি। আশীষ তুই বোস্।"

প্রণব ঘর ছেড়ে যাওয়ার খানিক বাদে চা হাতে নিয়ে রাণী ঘরে ঢুকলো।

এবারে তার পদক্ষেপ অতিশয় লঘু। জীবনের বিচিত্র সঙ্কেত সেই লঘু পদক্ষেপের ছন্দে ছন্দে দুলে চলেছে। তার মধ্যে যে কোথায় কী যে ব্যঞ্জনা আছে তা সে নিজেই জানেনা। বুঝিবা, তার ভাগ্য বিধাতাও নিখুঁতভাবে বলতে অক্ষম। কত বিপদের কণ্টকাকীর্ণ পথে এই এতটুকু বয়সেই তার চলতে হয়েছে,—আজ যদিও সে ক্ষত বিক্ষত, তবুও পায়ের তলায় পেয়েছে একটু চলার মত আস্তরণ,—কিন্তু কে জানে, সেই আস্তরণ কত দিন টেঁকে? অতি সন্তর্পনে আশীষের সামনে কাপটা এগিয়ে দিয়েই চলে যাচ্ছিল রাণী। বাধা দিলে বীণা। "কিরে, এসেই চলে যাচ্ছিস যে? এত লজ্জা কেনরে? আয়—বোস্ এখানে।" বলে তার পাশে জায়গা দেখিয়ে দিল। একটু ইতস্ততঃ করে রাণী বসে বীণার কাণের কাছে মুখ নিয়ে বললে, "উনুন যে জ্বলে যাচ্ছে।"

"যাক্ না একটু, আমি দেখবো এখন।"

আর কোন কথা না ব'লে জড়সড় হ'য়ে বীণার গা ঘেঁষে বসে রইল রাণী। তার এই সলজ্জভাবে বসার ভঙ্গীটি বীণার ভারী ভালো লাগল। পশ্চিমের জানালা দিয়ে ঢ'লে পড়া সূর্যের রক্তিম আলোকচ্ছটা একগোছা তীরের মতো এসে পড়েছে রাণীর সর্বাঙ্গে। ঢেউ তোলা চুলের রাশি তার সারা পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছে এলোমেলো ভাবে। পরণে প্রণবেরই দেওয়া সবুজ রঙের ব্লাউজ ও তাঁতের একখানা খয়েরী রঙের ডুরে শাড়ী। সুডোল হাত দু'খানিতে বীণারই হাতের দু'গাছা সোণার চুড়ি। এতেই যেন রূপ ফেটে পড়ছিল রাণীর। ঘরের মধ্যে এই রূপের সমজদার ছিল দুজন। আশীষের কথা কেউ বলতে পারেনা। কারণ এমন অবস্থার যুবকের মন নিয়ে এত লোকে এত কথাই লিখেছে যে, যে যা লিখবে, তাই হ'বে ভাড়া-করা কথা। কিন্তু বীণা! রাণীর অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানার দিকে অতৃপ্ত নয়নে চেয়ে থাকতে থাকতে অতর্কিতে সে এক কাণ্ড করে বসল। সযতনে দুহাত দিয়ে রাণীর মুখখানা তুলে বলে উঠল, "দেখ, ঠাকুরপো, এরকম একখানা মুখ দেখেছ?"

মুহূর্তের মধ্যে লজ্জায় রাণীর মুখখানা রাঙা হ'য়ে ওঠে। সেটাকে ঢাকবার জন্য অনন্যোপায় হয়ে সে জোর করে বীণার হাত সরিয়ে "যাও, তুমি বড্ড ইয়ে—" বলেই বীণা বাধা দেওয়ার আগেই বেরিয়ে গেল। একটু হেসে উঠল বীণা আশীষের মুখের দিকে তাকিয়ে। আশীষও একটু মুচকি হাসল। বলল, "সত্যি বৌদি, তুমি যেন কেমন, বেচারী লজ্জা পেয়ে পালালো তো!"

"ও খুব লজ্জা পেয়েছে। ওর ঐ ছেলেমানুষী ভাবটি দেখতে সত্যি আমার খুব ভাল লাগে।"

"তা হ'লে এখন আসি বৌদি।" চায়ের কাপটি শেষ করে উঠে পড়ল আশীষ।

"না, না এখন কী যাবে বসো।"

"একটু দরকার আছে বৌদি। এক জায়গায় যেতে হবে আবার," বলে আশীষ সবে দোরগোড়ায় পা বাড়াতেই বিস্মিত ও হতবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। শুনতে পেল বিন্দিঠাকুরাণীর সপ্তমে চড়া কর্কশ স্বর।

"জঞ্জাল, জঞ্জাল! আস্তাকুঁড়ের জঞ্জাল, মরতে আর জায়গা পেল না। মরতে এল কিনা আমার এখানে। বলি, এই হতভাগী, শোন্, এদিকে দাঁড়া।" এইভাবে ইতর সম্ভাষণে কুৎসিত ভাষায় রাণীকে গালিগালাজ করতে লাগলেন তিনি হেঁসেলের সামনে। রাণীর সঙ্গে সর্বদাই এটা ওটা নিয়ে নানা ছুঁতো-নাতায় লেগেই আছেন তিনি। তবুও আজকের এ ব্যবহারটা রাণীর কাছে যেন অসহ্য রকমের বিশ্রী বলে মনে হ'লো। এতদিন যা হয়েছে, ঘরে ঘরে হয়েছে, এমন ভাবে একজন বাইরের ভদ্রলোকের উপস্থিতিতে কি নিদারুণ এই লাঞ্ছনা!

ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রাণী চলার পথে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হাত নেড়ে খেঁকিয়ে উঠলেন বিন্দিঠাকুরাণী—"বলি—গিয়েছিলি কোথায় ?"

"বাইরের ঘরে—" সংযত হ'য়ে উত্তর দিল রাণী।

"কেন শুনি ?"

"চা দিতে।"

"চা দিতে ? কাকে ?"—কথাটা চিবিয়ে উচ্চারণ করলেন তিনি।

"প্রণব দা—" বলেই থেমে যায় রাণী।

কট্‌মটিয়ে তাকান তিনি রাণীর দিকে। বললেন, "নিয়ে গেলি তো দু'টো কাপ। আর কোন সুহৃদকে দিয়ে এলি শুনি ?"

বিন্দিঠাকুরাণীর তিক্ত কথায় এবার সত্যি বিরক্ত হ'য়ে পড়ে রাণী। বললে, "আমি চিনিনে তাকে।"

"চি—নি—নে!" বলেই বোমার মত ফেটে পড়েন তিনি। "বলি চিনিস্‌নে তো ঐ ঘরে গিয়েছিলি কেন? এদিকে উনুনের আঁচ পুড়ে যাচ্ছে, সে খেয়াল আছে রাজরাণীর? আরেক রাজ নন্দিনীরও কি এদিকে দৃষ্টি আছে কিছু!" বলেই রাণীর দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "কিরে, কেন গিয়েছিলি ও ঘরে?"

"আমি যেতে চাইনি।'

"তুই যেতে চাসনি? তবে বুঝি ঐ ছোঁড়াই তোকে—?"

"শুনলে, শুনলে ঠাকুরপো!" অধৈর্য হ'য়ে ওঠে বীণা বিন্দি-ঠাকুরাণীর কুৎসিত ইঙ্গিতে,—এগিয়ে এসে আশীষের হাত ধরে একটা ঝাঁকুনী দিলে,—"শুনলে তো সব। এমনি করে রাতদিন মেয়েটার উপর অত্যাচার করে যাচ্ছেন। অনাথা একটা মেয়ে বিপদে পড়ে একটু আশ্রয় পেয়েছে, তাই বলে কি এমন করে অপমান আর নির্যাতন সইতে হবে তাকে দিনের পর দিন!" একটু থেমে আবার বললে, "তাই সব সময় আমার ভয় হয় এমন অত্যাচার সইতে না পেরে ও বাড়ী ছেড়ে শেষে না চলে যায় আবার নিরুদ্দেশের পথে।"

তিন

বীণা যা আশঙ্কা করেছিল একদিন তা সত্যিই সত্যে পরিণত হ'লো। সেদিন বীণা ছিলনা বাড়ীতে। গাঁয়েরই একটা বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিল প্রণবের সঙ্গে। বীণার ইচ্ছা ছিলনা যেতে। কি করে রাণীকে ফেলে যাবে সে? কিন্তু রাণী বীণাকে পাঠিয়ে দিল জোর করে।

"সে কি বৌদি! আমার জন্য তুমি বিয়ে বাড়ী যাবে না?"

"নাই বা গেলাম, তাতে কি হ'লো রাণী! তোর দাদাইতো যাচ্ছেন।"

"না, তা হয় না। মাসীমা বাড়ী আছেন। তিনি যদি শোনেন তুমি যাওনি, তাহ'লে আবার এক কেলেঙ্কারী সৃষ্টি করবেন। বলবেন, এই পোড়ারমুখীকে নেমতন্ন করেনি বলে—"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বীণা বলে উঠল, "আরেক পোড়ারমুখী গেল না," বলেই হেসে উঠল।

রাণীও একটু হেসে বললে, "যা বলেছো বৌদি!"

"বেশ, তাহলে যেতে বলিস আমাকে?"

"হঁা, বৌদি।"

"কিন্তু তুই যে একা থাকবি।"

"একা থাকব কেন—মাসীমা তো আছেন পাশের ঘরে।"

"তুই তো মাসীমা মাসীমা করিস রাণী, কিন্তু মাসীমা যে কি—"

"তা ছাড়া ক্ষেপীর মা তো আছে।"

"সে তো নেই। ও এইমাত্র চলে গেল। নাতির অসুখ করেছে বলে

"তা হোক তবুও তুমি যাও।"

চলে গেল বীণা প্রণবের সঙ্গে বিয়েবাড়ীতে। তখন বিকেল পাঁচটা হবে। শীতের বেলা। পাঁচটা বাজতেই বেশ আঁধার নেমে এলো। বীণা চলে গেলে রাণী তার নিত্যকার কাজগুলি সমাধা করতে লাগল একটির পর একটি করে। এ বাড়ীতে আসার পর থেকেই রাণী ঝি থাকা সত্ত্বেও সকালে বিকালে ঘর-দোর ঝাড় দেওয়া, কাপড় তুলে গুছিয়ে রাখা, বিছানা করা সবই করত। বীণা বাধা দিলে সহাস্যে বলত আমায় একেবারে বসিয়ে রেখে রাণী বানিয়ে তুলোনা বৌদি। একআধটুকু কাজ নিয়ে না থাকলে কি করবো সারাদিন ?"

সেই থেকে বীণা রাণীকে এসব খুটি নাটি কাজে বাধা দিতনা।

আজও বীণা বিয়েবাড়ী চলে যাবার পর রাণী বিকেলের কাজগুলো গুছিয়ে প্রণবের বিছানা ঝেড়ে পরিষ্কার করছিল। এমন সময় বিন্দিঠাকুরাণীর আবির্ভাব। একখানা গরম চাদর তাঁর গায়ে জড়ানো। চাদরের নীচে রুদ্রাক্ষের মালা। জপ করতে করতে বিষ-দৃষ্টিতে দেখলেন তিনি রাণীর কাজ। তাঁর ছেলের ঘরে এই অচেনা-অজানা মেয়েটার এত কী দরকার! যখন তখন কেন এ ঘরে ঢোকা— কী মতলব ওর! প্রণবের বিছানায় হাত দিতে দেখে জ্বলে উঠলেন তিনি, "বলি আমার ঘরের বৌ কি মরে গেছে হতভাগী ? তার ঘরে তোর আনাগোনা কেন রে ? বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় বলছি। আস্পর্ধা দেখ!" এই ব'লে জলন্ত কুণ্ডের মতো তাকিয়ে রইলেন রাণীর দিকে।

রাণী সভয়ে বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। দাঁড়াল বিন্দিঠাকুরাণীর হাত দুই দূরে। হাতের মালাটা ঘুরাতে ঘুরাতে বললেন তিনি, "এখনও বলছি মেয়ে, যদি

ভাল চাস্ তো ভালোয় ভালোয় সড়ে পড়্। বাড়ীর ছেলেকে উচ্ছন্নের পথে টেনে নিস্‌নে। সাবধান করে দিচ্ছি।"

হঠাৎ যেন বজ্রাঘাত হলো রাণীর মাথায়। কিছুক্ষণ সে কোনো কথাই বলতে পারলোনা। পরে কিছুটা সামলে নিয়ে কানে হাত চাপা দেয় রাণী। হাঁপাতে থাকে ঐখানে দাঁড়িয়ে। 'সে কেন এখনো বেঁচে আছে? আর বেঁচেই আছে যদি তবে কেন সে বধির হয়ে গেলনা এ কথাটি শোনার আগে। অসহ্য হ'য়ে উঠল তার এই মর্ম বেদনা। দারুণ এক দুর্ভাগ্যের গ্লানিতে বলে উঠল সে, "একি বলছেন আপনি ?"

"যা বলেছি ঠিকই বলেছি," এই বলে কটু কণ্ঠে গর্জন করে উঠলেন তিনি। বিন্দিঠাকুরাণীর জবাবে ধৈর্যের বাধন হারিয়ে ফেলে রাণী। দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বললে, "আপনি প্রণবদার মা, —আমার মাসীমা। প্রণবদার আমি ছোট বোন—কী করে আপনি এমন কথা মুখে আনলেন ?"

নিজেকে সামলাতে না পেরে পাশের থামটি জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল রাণী। এত কথা বলবে সে ভাবতেও পারেনি এক মুহূর্ত আগে।

বিন্দিঠাকুরাণী কিন্তু এই হতভাগীর কান্না শুনতে পেলেন না,—শুনলেন খালি তাঁর শেষের মন্তব্যটি। কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে পড়ল। দ্বিগুণ ক্ষেপে উঠলেন তিনি। "কি ছোট মুখে বড় কথা ? আমার কথার ভাল মন্দের বিচার করবি তুই ?"

অসহায় ভাবে তাকায় রাণী মাসীমার দিকে। তার তাকানো দেখে আরও জ্বলে উঠলেন বিন্দিঠাকুরাণী।' বললেন, "ঐ ড্যাব ড্যাবে চোখ দিয়ে হাবার মত তাকিয়ে থাকলেই হবেনা। দূর্ হয়ে যা এ বাড়ী থেকে। এক্ষুনি তোকে ছাড়তে হবে আমার বাড়ী।"

"এক্ষুনি ?" চমকে উঠে রাণী।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্ষুনি।"

রাণীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। "কোথায় যাবো ?" কেঁদে ফেলে রাণী।

"কোথায় যাবে তাও আমায় বলে দিতে হবে? ঢঙ্ দেখে আর বাঁচিনে। ওঃ, মেয়ে বটে! বলি আর কোথাও যেতে না পারিস্ ত ঐ যমডোবায় যা না!"

"যমডোবায়!" আতঙ্কে শিউরে ওঠে রাণী।

যমডোবা যে কি—কেন যে একটা সামান্য ডোবার নাম যমডোবা হ'ল সে কাহিনী অনেক দিন সে বীণার মুখে শুনেছে। বীণাদেরই বাড়ী থেকে কিছুটা দূরে পশ্চিম কোণে এই ডোবা। ডোবার চারিদিকে বুনো জঙ্গল ঝোপ-ঝাড়। ডোবা ভর্তি কচুরী পানা। এই ডোবাতে বহুদিন আগে গাঁয়ের ছু'টি বউ আত্মহত্যা করেছে বলে লোকের মুখে মুখে শোনা যায়। গাঁয়েরই গোপলার মা আর ফেলী পিসী—তারা নাকি স্বচক্ষে দেখেছিল দিনের বেলায় ঐ বউ ছু'টির ছায়ামূর্তিকে ডোবার চারধারে ঘোরাফেরা করতে। শুধু ঘোরাফেরা নয়, ঐ ছায়ামূর্তি ছু'টি মেয়েদের ডোবার ধারে দেখলেই হাত বাড়িয়ে যায় ধরতে এবং এ গাঁয়েরই ছু'টি বৌকে ধরেও নিয়ে গিয়েছিল। তারপর তাদের মৃত দেহ ছুটো পাওয়া গেছে এই ডোবাতে। তা নাকি গোপ্‌লার মা আর ফেলী পিসীর স্বচক্ষে দেখা। সেই থেকে ঐ ডোবার নাম দেওয়া হয়েছে যমডোবা। আর সেই থেকে এ যমডোবায় গাঁয়ের মেয়ে-বউরা তো আসেই না—বেটা ছেলেরাও না। সেই যমডোবায় যেতে বলছেন তিনি তাকে ? সোজা পথ দেখিয়ে দিলেন তিনি!

"য-ম- ডো-বা-য়—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যমডোবায়।"

অসহায় চোখ দুটি রাণীর হতাশায় ফাঁকা বলে মনে হয়। কী যেন ভাবতে থাকে বিন্দিঠাকুরাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে দিশেহারা হ'য়ে। এমন অবস্থায় ভাববারও শক্তি আছে তার! তবু ও ভাবে। ভাবে সে নিজেরই কথা। মা বাবা কি নামই দিয়েছিলো তাকে : নামটা যেন কুৎসিত মুখভঙ্গী করে ব্যঙ্গ করছে তাকে নানান্ ছাঁটে-ছন্দে। এযাবৎ যা পেয়ে এসেছে জীবনে তাও যেমন রাণীর মত, আজ যা পেলো তাও তেমনি! কিন্তু কেন এতও সইতে হবে? এত অপমানের পরেও কি থাকবে সে এখানে মিছে কলঙ্কের বোঝা মাথায় বয়ে, মিছে দুর্নাম সয়ে,—দাদা আর বৌদির কাছে দিনের পর দিন এমনি করে কাটাবে সে? না, না, না সে হয়না, সে অসম্ভব—অসম্ভব—অসহ্য! এত লাঞ্ছিত অপমানিত জীবনে কেনই বা এত মায়া? ধিক্কার এসে যায় রাণীর জীবনে। উন্মাদিনীর মত বলে ওঠে রাণী, "যাবো, যাবো আমি যমডোবায়। যমডোবাই আমার শেষ আশ্রয়!" বলে সে শেষবারের মত যাবার আগে একবার প্রণবের ঘরখানার দিকে ফিরে তাকাল কেমন যেন একটা দৃষ্টি দিয়ে। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে, কী যেন দেখলে, কী যেন ভাবলে। তার মুখের চেহারা কি করুণ—কি ভয়াবহ!

এ বাড়ীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়ল সে। এবার আর তরুর 'মার সঙ্গে নয়। কোথায় পাবে তাকে? একটা নির্ভর-যোগ্য আশ্রয়ে তার রাণীমাকে তুলে দিয়ে সে তার কর্তব্য শেষ করে চলে গেছে। তাই একা, একেবারে একা—অচেনা অজানা পথে—বুঝি বা শেষের পথে! রাস্তায় বেরিয়ে তাকিয়ে নেয় একবার চারিদিকে। একটু যেন আশ্বস্ত হয় ধারে পাশে কোনো লোকজন দেখতে না পেয়ে। লোকজন দেখবে কী করে? সে তো আর

সদর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেনা, আর পাঁচজন পথচারীর মত। উত্তেজনার বশে—ঝোঁকের মাথায়, ঝোপ জঙ্গলের বুক চিরে হন্‌হন্ করে এগিয়ে চলেছে সে যমডোবার দিকে। কিন্তু একি! যমডোবার সামনে এসে এতো হাসি পাচ্ছে কেন? পাগল হ'য়ে গেছে নাকি? না, না, এই তো দিব্যি এগিয়ে যাচ্ছে যমডোবার দিকে গুরুজনের নির্দেশ পালন করতে! কিন্তু কি আশ্চর্য্য একটুও তো ভয় করছেনা! কোথাথেকে এত সাহস হ'লো? মরবার আগে কি সকলেরই হয় এমনি ধারা? ভাবতে ভাবতে তাকায় রাণী আকাশের দিকে। সেখানে পূর্ণিমার চাঁদ মেলে দিয়েছে তার আলোর চাঁদোয়া। রূপালী আলোয় ঝল্‌মল্ করছে সারা আকাশ, সারা পৃথিবী! এতক্ষণ এই আলোর খেলা চোখে পড়েনি রাণীর। চেয়ে দেখলো সে—নিস্তব্ধ নিঝুম চারদিক; বনালা গাছের ঝোপ-ঝাপের উপর দিয়ে যেন এক শুভ্র লাবণ্যের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। কি যেন মায়া মাখানো আছে এদের গায়—যাতে দর্শক একবার দেখলে আর চোখ ফিরাতে পারেনা। অভাব হ'লো খালি দর্শকের। কে যাবে জীবনের মায়া ত্যাগ করে সেই নির্জন বনালায়? যেখানকার কুৎসিত ইতিহাস হাড়ের মধ্যে আতঙ্ক জাগায়? কিন্তু যে একবার যেতে পারে সাহস করে, বুঝি সেই কেবল দেখতে পায় প্রকৃতিরাণীর ওই নগ্ন সৌন্দর্য। তবে কি কেবল শেষের পথে যারা পা বাড়িয়েছে তাদেরই চোখে ধরা দেয় এই ঐন্দ্রজালিক সৌন্দর্য? তবে হয় তো রাণী যা শুনেছে সব ভুল, হয়তো এখানে এসে যারা আর ফেরেনি, তারা এই ইন্দ্রজালেই মুগ্ধ হয়ে এদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কোন্ আনন্দময় লোকে চলে গেছে,—প্রেত মূর্তির হাতে মরেনি!

কিন্তু রাণীর এই তন্ময়তা বেশীক্ষণের নয়। যেই মনে হলো যে

কই, তার তো ভয় করছে না, অমনি জাগলো সৌন্দর্যের পিপাসা। তবে তো পৃথিবী কেবলই কালো—জীবন কেবলই দুর্ভোগ নয়। আলোও আছে এখানে, শান্তিও আছে। একি হলো তার? মায়া জাগে কেন আবার এই জীবনের প্রতি? একপা দু'পা করে পিছোতে থাকে রাণী। তার ইচ্ছে করে বাড়ী ছুটে চলে আসতে। কিন্তু, বাড়ী? কোথায় তার বাড়ী? না—না দু'হাতে চোখ চেপে ধরে রাণী দিশেহারা হ'য়ে। চোখ বুজতেই দেখতে পায়, বিন্দিঠাকুরাণীর পিশাচী মূর্তি—অভিশাপের সম্মার্জনী আস্ফালন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা বাড়ীময়! না-না-না, বাড়ী নয়, তার ভুল হয়েছে, ঐ পিশাচীর চাইতে এখানকার প্রেতমূর্তির হাতে আত্মসমর্পন করা ঢের ভালো। কারণ এতে স্বাধীনতা আছে। চিরকাল পরের দুয়ারে লাঞ্ছিত হয়েছে সে, আজ জীবনের শেষ মুহূর্তে একটিবার স্বাধীন ভাবে একটি ইচ্ছা সে পূরণ করবেই।

দ্রুত বেগে আবার ধেয়ে গেল সে নিবিড় জঙ্গলের দিকে, —সেই যমডোবায়। চারদিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকায় রাণী। কোথা থেকে যেন তার অন্তরে সাহস আসে দ্বিগুণ হয়ে। আপনমনে বললে, "কই, কোথা সে ছায়া মুর্তি দুটি, এসো, দেখা দাও। আমায় কোলে তুলে নাও তোমাদের। ওকি! তোমরা আসছ না কেন? বৌদির কাছে শুনেছি, মেয়েদের এই যমডোবাতে দেখলেই তোমরা দুটিতে ছায়ামূর্তি ধরে তাদের নিয়ে যাও তোমাদের কাছে। আমি যে তৈরী হয়ে এসেছি। আমায় তুলে নাও তোমাদের কোলে। কেন তোমরা আসছনা? শুনেছি, তোমরা এই যমডোবাতে আত্মহত্যা করেছ। কেন করেছ আত্মহত্যা? আমার মতই কী লোকের কাছে লাঞ্ছিত, অপমানিত আর বিতাড়িত হয়ে? তাই যদি হয়, তবে আমিও তো তোমাদের মত দুঃখিনী," বলেই রাণী

উন্মাদিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়তে যায় যমডোবায়। কিন্তু একি! কে তাকে বাধা দিল, কে তাকে পেছন থেকে দুটি সবল বাহু দিয়ে সজোরে জড়িয়ে ধরল। ভয়ে শিউরে ওঠে রাণী। এক মুহূর্ত্তে মনের জোর ও সাহস কোথায় মিলিয়ে গেল তার! যমদূত মনে করে চমকে ফিরে চাইল রাণী, "কে-কে তুমি?"

পুরুষের কণ্ঠে শুনলো—"আমি।"

"আ-প-নি—আ-প-নি—কেন—কেন আপনি এখানে?" বলেই রাণী আশীষের বাহু বন্ধন থেকে চঞ্চল হ'য়ে দূরে সড়ে যেতে চায়!

ছাড়েনা আশীষ রাণীকে। শক্ত করে আঁকড়ে ধরে তাকে। বললে, "তুমিই বা এখানে কেন?"

হাঁপাতে থাকে রাণী, "সে কৈফিয়ত নাইবা নিলেন।"

"না শুনলেও আমি বুঝতে পেরেছি কেন তুমি এ সময় এখানে এসেছ। রাণী, কেন তুমি আত্মহত্যা করছো?"

"আত্মহত্যা!" রাণীর সম্বিত যেন ফিরে আশে। নিজেকে একটু প্রকৃতিস্থ করে। "আমি—আমি আত্মহত্যা করছি কী করে আপনি বুঝলেন?"

"আত্মহত্যা নয় তো কী? এই মাঘের শীতে যমডোবায় যেখানে দিনের বেলায় যেতে ভূতের ভয়ে লোকে কাঁপে, সেখানে তুমি এমন অসময়ে ঐ কালো জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছ! এটাকে কী মনে করবো তবে?"

পরাজয় মানতে হয় রাণীকে। নিরুপায় হয়ে বলতে থাকে, "এছাড়া যে আমরা আর কোন উপায় ছিলনা।" বলতে গিয়ে দুঃখের ভারে ভেঙ্গে পড়লো রাণী।

"এসো, সহজ মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে কথা বলার মতো জায়গা

এটা নয়,"—এই বলে আশীষ তাকে নিয়ে এলো বন-জঙ্গল পার করে, সর্ষে ক্ষেতের সরু আলের উপর দিয়ে একেবারে প্রণবদের খিড়কীর পুকুরের পশ্চিম পারে। এই পুকুর পারের চার কোণে চারটে ছোট ছোট মন্দিরের মত চাঁপাগাছ প্রণবের নিজের হাতে পোঁতা। আর পশ্চিম পাড়টা হ'লো গোলাপ বাগান। চাঁপা গাছে এখনও ফুল ফোটেনি বটে কিন্তু শীতের শিশিরে গোলাপের ফোটা বন্ধ হয়নি। পূব আর পশ্চিম এই দুই পারের অনেকখানি জমি নিয়ে সিমেন্টের ঘাট গাঁথা, তাতে এক সঙ্গে অনেক লোক বসে গল্পগুজব করতে পারে। আশীষের মোড়লামীতে এই ঘাটেই অনেকবার চড়িভাতি হয়েছে।

এতরাত্রে খিড়কীর দরজা বন্ধ হ'য়ে গেছে। আর কেউ এখন ঘাটে আসবেনা। তাই আশীষ রাণীকে এই খানেই একটু বসতে বললো, কারণ তাকে একটু সুস্থ করে তুলতেই হবে।

দু'চার মিনিটে দুজনেই স্তব্ধ হয়ে রইল। বেশ বোঝা গেল রাণী এতক্ষণে রীতিমত সলজ্জ হয়ে উঠেছে। গায়ের কাপড় এলো-মেলো হয়ে ছিল এখন সেটা ঠিক করে নিল। শুধু চোখ দুটোর চেহারা এখনও প্রকৃতিস্থ হয়নি। বড় বড় করে চেয়েই আছে আকাশের দিকে।

মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করলো আশীষ, "কিন্তু একাজ কি তোমার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে ঠিক হয়েছে ?"

"ঠিক অঠিক বুঝিনে আমি, আমি আর মিছে কলঙ্কের বোঝা সইতে পারিনে।" বলতে না বলতেই তার চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে, আশীষেরও চোখ সজল হয়ে ওঠে। সমবেদনার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললে, "সে কলঙ্ক যে সত্যি নয়, এটা ভেবে কেন মনকে সান্ত্বনা

দাওনা।" তারপর একটু থেমে বললে সে, "দাদা বৌদির কথা ভেবেছ কী?" বলেই আশীষ একটু কাছে সরে এলো।

যমডোবার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে বলে যায় রাণী, "ভেবেছি, ভেবেই আমি একাজ করবো বলে সঙ্কল্প করেছিলাম। কিন্তু কেন—কেন আপনি আমায় বাধা দিলেন?" ধৈর্য হারিয়ে ফেলে রাণী। একটা রুক্ষতা ফুটে ওঠে তার স্নিগ্ধ কোমল মুখে। অপরাধীর মত বলে যায় আশীষ, "প্রণবদার কাছে দরকার ছিল বলে এই বাড়ীতে যেই ঢুকতে যাবো. এমন সময়ে দরজার বাইরে থেকেই মাসীমার তর্জন গর্জন শুনতে পেলাম। তখন সেই অবস্থায় আমার যাওয়াটা অসমীচীন ভেবে ফিরেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ দেখি তুমি খিড়কীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে উন্মাদের মত ছুটে চলেছো। মনের উদ্বেগ চাপ্‌তে না পেরে, তোমার অনুসরণ করেই এখানে এসেছি।"

"আমাকে বাঁচাতে—না?"

"তা ছাড়া কী?" বলেই অপাঙ্গে একবার রাণীর মুখের দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় আশীষ। তার কথার ধরণে কোথায় যেন একটু খোঁচা লাগে তার। বেশ অবাক হয়ে যায় সে।

''কিন্তু আমায় বাঁচানো কেন? মজা দেখবার জন্যে?"

"ছি, এ কি কথা বলছো তুমি?"

"যা বলেছি সবইতো শুনলেন। আপনি জানেন, আমার বেঁচে থাকা মানে দাদা বৌদির চির কণ্টক হয়ে থাকা।"

"এটা তোমার ভুল ধারণা রাণী, আজ যদি তুমি আত্মহত্যা করে এই যমডোবায় প্রাণ বিসর্জন দিতে, তাহ'লে দাদা বৌদির কী অবস্থা হ'তো একবার ভেবে দেখেছ কী?"

"দেখেছি,'' তেমনি ভাবে যেদিকে যমডোবা সেদিকে তাকিয়ে বলল

রাণী, "কিন্তু, মনের কষ্ট দুদিন বাদেই ভুলে যেতেন। পুত্র শোকও মাকে একদিন ভুলতে হয়,—আমি তো পর!"

"শুধু কী তুমি এইটুকুই ভেবেছ রাণী? তোমার মৃত্যুতে দাদার যে কত বড়ো শাস্তি হ'তে পারে তা একবার ভেবেছ?"

"শাস্তি?" বলে শঙ্কিত নয়নে তাকায় রাণী আশীষের দিকে।

"হাঁ শাস্তি।"

"কে দেবে তাকে শাস্তি!"

"কেন আইন।"

"আইন?"

"হাঁ আইন।"

"কিন্তু তিনি তো কোন দোষ করেন নি।"

"সে কে বুঝবে রাণী। এই দেখ না, গাঁয়ের লোক এমনিতেই চটে আছে দাদার উপর—তা বোধ হয় জানো?

"জানি, দাদা আমায় আশ্রয় দিয়েছেন বলে ঘরে ঘরে অনেক কথাই—"

"সে যাক্," বাধা দেয় আশীষ, "মনে কর এই যমডোবাতে তোমার মৃতদেহটা কাল ভোরে গাঁয়ের লোকের নজরে পড়লে, থানায় খবর যেত। তারপর যা সত্যি নয় সে সব মিছে জবানবন্দি দিয়ে গাঁয়ের লোকে দাদাকে হাজতে পাঠিয়ে দিত।"

"না, না সে হতো না। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম।"

"কেন নিশ্চিন্ত ছিলে?"

"এ ডোবার কাহিনী কেনা জানে বলুন? আমার মৃতদেহ ভেসে উঠলে, সবাই মনে করত এ সেই প্রেত বৌ দুটির কাণ্ড। নয় কী?"

"না। যদিও গাঁয়ের লোক তাই মনে করে। কিন্তু পুলিশের জেরার ভয়ে সকলেই এক জোট হয়ে দাদার ঘাড়েই সব চাপিয়ে

দিত। আর সেই সুযোগে তোমায় আশ্রয় দেবারও প্রতিশোধ নিত। কোন জন্মে এখানে কারাই বা মরেছিল আর কারাই বা দেখেছিল কতটুকু কথা তার সত্য, তা কে বলবে বলো? গাঁয়ের লোকের মধ্যে যারা এমন ভৌতিক কাণ্ড দেখেছিল এবং ভৌতিক গল্প করেছিল সে গোপ্‌লার মাও বেঁচে নেই আর ফেলীপিসীও বেঁচে নেই। লোকের মুখে মুখে তো কত রকমের গুজবই শোনা যায়। কিন্তু কতটুকু তার সত্যি হয়। যদি সত্যিই হবে তবে সেই মৃত বৌ দুটি প্রেতমূর্তি ধরে তোমায় তখনও কেন ধরে নিয়ে গেলনা বলতে পারো?"

আশীষের কথা চিন্তা করতে করতে এ রাজ্য ছেড়ে কোন রাজ্যে যেন চলে যায় রাণী। তার যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি শুনে লজ্জিত ও শঙ্কিত হয়ে উঠলো সে। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, "উঃ, আমি তো এমন করে ভেবে দেখিনি। এমন লোকও জগতে আছে মিথ্যে কথাকে সত্যি বলে গুজব রটায়! আবার সত্যি কথাকেও মিথ্যে বলে তেমনি গুজব রটায়—তাই না?"

"নিশ্চয়। এই তোমাকে দিয়েই দেখনা। তোমার নামে মাসীমা যেসব মিথ্যে দুর্নাম রটাচ্ছেন তার কতটুকু সত্যি? তুমি কী জাননা?"
"জানি। আমি সব বুঝতে পেরেছি এখন। আমি—আমি আত্মহত্যা করবোনা—করতে পারবোনা,"—রাণীর কণ্ঠে আকুলতা ঝরে পড়ে, "যে দাদা বৌদি আমার জন্যে এত করছেন, আমার জন্য তাদের শাস্তি আমি হ'তে দেবোনা। আমি ফিরে যাবো দাদা বৌদির কাছে।" বলেই রাণী আশীষের দুখানা হাত এবার সে নিজেই চেপে ধরে। বাধা দেয় না আশীষ। রাণীর স্পর্শে তাঁর সারা মনে কিসের যেন ঢেউ জেগে ওঠে।

কিন্তু অতর্কিতে আশীষের হাত দুখানা ধরে ফেলে বেশ লজ্জিত হয়ে পড়ে রাণী। সেই মুহূর্তে তার হাত দুখানা ছেড়ে একটু সরে দাঁড়ায় সে আশীষের কাছ থেকে। গায়ের এলোমেলো কাপড় খানা আবার একবার ঠিক করে নেয় সে। নিজের মনেই আবার বলে উঠে রাণী, "আমার যে মুখ নেই ফিরে যাবার। ফিরে গিয়ে কী কৈফিয়ৎ দেব দাদা বৌদিকে।"

"দাদা বৌদি কি বাড়ী আছেন এখন ?"

"না।"

"কোথায় গেছেন তাঁরা ?"

"বিয়ে বাড়ী।"

"বিয়ে বাড়ী ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহ'লে হয় তো তারা এখনও ফেরেননি। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী ফিরে যাও। তা তোমায় একা ফেলে বৌদি—"

"না, বৌদি যেতে চাননি। আমি জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তখন মাসীমা শান্তই ছিলেন। বৌদি চলে যাওয়ার পর মাসীমা আমায় যা-তা বলতে লাগলেন। সে সব সইতে না পেরে—সইতে না পেরে কি,—সইছি তো সব সময়। কিন্তু যখন দাদাকে উদ্দেশ্য করে আমায় জঘন্য কথা—" আর বলতে পারেনা রাণী। গলার স্বর চেপে আসে।

বাধা দিয়ে সহানুভূতির স্বরে বললে আশীষ, "আর বলতে হবেনা রাণী। আমি মাসীমাকে জানি। এই দাদা বৌদি তোমার মতো আমায়ও একদিন বলতে গেলে পথ থেকেই কুড়িয়ে নিয়েছিলেন। ছিলামও দাদা বৌদির কাছে কিছুদিন। কিন্তু, বেশী দিন থাকতে পারলামনা।"

"ও! তাই বুঝি? আপনি ও আমার মতো—?"

"হ্যাঁ, তোমারই মতো!"

এই 'আমার মতো তোমার মতো' কথাগুলো যেন দু'জনেরই কাণে একটা অদ্ভুত প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুললো। রাণী যেন কেমন আনমনা হ'য়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। তারই মত আর একজন পথে কুড়িয়ে পাওয়া, আর তারই মত লাঞ্ছিত অবমানিত! তার চিন্তায় বাধা পড়লো আশীষের কথায়।

"কি ভাবছো অত? বাড়ী যাবেনা?"

চমকে ওঠে রাণী আশীষের কথায়। তৎক্ষণাৎ সংযত হ'য়ে বলে, "কিন্তু, বলুন তো, বাড়ীতে যে যাবো, সবাই এমন দুর্নাম রটালে সইব কি করে?"

আশ্বাস দেয় আশীষ,—"কিছু দিন ধৈর্য ধরে থাকো। দাদা বৌদি তোমার সম্বন্ধ দেখছেন। আমারও ভাগ্যি বলতে হবে যে, সে সম্বন্ধ দেখবার ভার আমাকেই দিয়েছেন তাঁরা। ভালো একটি পাত্র পেলেই শীগগিরই তারা তোমার বিয়ে দিয়ে দেবেন।"

অকস্মাৎ রাণী নির্বোধের মত প্রশ্ন করে বসল, "তারপর?"

"তারপর আর কি, তুমি নোতুন বরটীকে পেয়ে আনন্দে ছোট্ট একটি শান্তির নীড় বাঁধবে—হাসবে, খেলবে, বেড়াবে।"

"কিন্তু তা না হ'য়ে যদি উল্টো হয়?"

একটু হাসে আশীষ, উপভোগ করে রাণীর এই প্রগল্‌ভতা। পরে বললো, "না, না—তা হবেনা। এ আমি হলফ্ করে বলতে পারি। তোমার ভাবী শ্বশুরবাড়ীর দুএকজন হয় তো বা একটু এদিক ওদিক হ'তে পারেন। কিন্তু তোমার বরটি যে, একজন অসাধারণ ভাল মানুষ হবে, এটা কিন্তু ঠিক।" কথা কয়টি বলেই আশীষ শুভ্র জ্যোৎস্নায় একবার রাণীর মুখের ভাব লক্ষ্য করল।

"কিন্তু আপনি কী করে বুঝলেন ?"

"কী করে বুঝলুম ?"

"হাঁ।"

একটু ইতস্ততঃ করে আশীষ। কিন্তু সে নিতান্ত ক্ষণকালের জন্য। তারপরে প্রশান্ত চোখদুটি রাণীর মুখের উপর মেলে দিয়ে সহজ গলায় বলে গেল, "জগতে একমাত্র নিজের কথাটিই সব চেয়ে জোর দিয়ে বলা যেতে পারে !"

রাণী কিন্তু চেয়েই রইলো আগের মতো। হয়তো কথাটার মর্ম বুঝতে তার একটু সময় লেগেছিল, হয়তো বা বুঝতে পারলেও বিশ্বাস করতে তার দেরী হচ্ছিল। কিন্তু সব দ্বন্দ্বের নিরসন হলো যখন আশীষ রাণীর পাশ থেকে একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়ে তার ডান হাতখানি নিজের হাতে তুলে নিয়ে ডাকলো, "রাণী !" রাণীর সর্বাঙ্গ শির্‌শির্ করে উঠলো। এই স্পর্শ ও এই সুরের আহ্বান তার জীবনে এই প্রথম। সর্বপ্রথম আশীষ যে তাকে যমডোবায় ঝাঁপ দেওয়ার সময় দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছিল, তখন রাণীর স্বাভাবিক অনুভূতি ছিল আচ্ছন্ন। এক উৎকট বিভীষিকার মধ্যে রোমাঞ্চের ছিলনা কোন অবসর। যে বাঁচিয়েছিল সে পুরুষ কি মেয়ে তাও তখন বিচার করার মতো চেতনা তার ছিলনা। কিন্তু এখন তার সমস্ত নারী সত্তা জীবন্ত ও জাগ্রত। তাই এক পুরুষের দরদী স্পর্শ ব্যর্থ হলো না তার নারীসত্তাকে জাগিয়ে তুলতে। চিরলাঞ্ছিতার এই আদর তাকে আর এক রকমে অসাড় করে দিল যেন। রাণী এবারে হাত সরিয়ে নিলোনা। সে দাঁড়িয়ে রইলো যেন তার জীবনের সব কিছু ঐ চাঁদের আলোয়-ধোয়া আশীষের প্রশান্ত হাতে তুলে দিয়ে।

"পারবেনা, রাণী, আমাকে চিরকালের করে নিতে ?"

তন্ময়তায় আবিষ্ট বিহ্বল রাণীর মুখে কথা জোগালো না। সে যেন এই মাটির পৃথিবী থেকে চ'লে গেছে অনেকদূরে—কোন এক স্বপ্নলোকের আলো-করা চির বসন্তের রাজ্যে। তার এই সুখ একেবারেই অবিশ্বাস্য। আশীষ তার জীবনে কল্পনার অতীত। আর সেই আশীষই তার হাতখানি ধরে তাকেই কি না জিজ্ঞাসা করছে—সে পারবে কিনা তাকে পতিরূপে গ্রহণ করতে? একি কখনও সম্ভব? আশীষ কি, আর সে কি!
সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসে তার মনে তারই দুঃস্থ অসহায় জীবনের করুণ ছবি! তাই খানিকক্ষণ মুগ্ধদৃষ্টিতে আশীষের দিকে চেয়ে থাকার পরই হঠাৎ নামিয়ে নিলো সে মুখখানি, আর আশীষ দেখতেঁ পেলো মুক্তোর মতো অশ্রু বিন্দু ঝরে পড়ছে তার উন্নত বক্ষের আবরণখানি ভিজিয়ে।

বুঝতে কষ্ট হলোনা আশীষের রাণীর এই মনের জটিলতা। সে এবার দুহাতে সজোরে ধরলো রাণীর দুখানি নিটোল বাহু। দেখলো তার সেই তারুণ্যে ভরা দেহলতাখানি থরথর করে কাঁপছে। এক রকম জোর করেই তাকে বসালো আশীষ সেই বাঁধা-ঘাটের উপর, আর নিজে বসলো গা ঘেঁষে। আবার ডাকলো তাকে নাম ধরে, তেমন আদরে, বুঝি বা ততোধিক মমতায়। এ ডাকের অর্থ যে রাণীর মতামত চাওয়া তা রাণীও বুঝলো। কিন্তু তার আবার মতামত কি? চাপাকান্নার মধ্যেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—"কিন্তু, আমি কি তোমার—?" একেবারে আশীষের কোলের মধ্যেই লুকিয়ে ফেল্‌লো সে তার মুখখানি, আর ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। এ তার মুখ দিয়ে কি বেরুলো? কিন্তু সে কি করবে? এই জন্যে আশীষই দায়ী। সে তার কঠিন জীবনের নিভৃত কন্দরে অবস্থিত কোমল তন্ত্রীতে এমন

ভাবে সুর বাজিয়েছে যাতে রাণীর হৃদয়বীণা না বেজে উপায় নেই। কিন্তু রাণীর ঐ 'কিন্তু' যুক্ত অসমাপ্ত কথাটির আশীষ যেন কিছুই বুঝলো না। তাই সে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আবার ডাক্‌লো "রাণী!"

সহসা মাথা তুলে উঠে বসলো রাণী, "না, না। সে হয় না!"

"কেন?"

"আমি যে পথের মেয়ে!" বলেই উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে রাণী একেবারে ফেটে পড়লো। আশীষ যেন প্রস্তুতই ছিল এমন একটা কিছুর জন্যে। তৎক্ষণাৎ তার হাতে একটা চাপ দিয়ে বলে, "জানো রাণী, আমাদের শাস্ত্রে বলে—স্ত্রী-রত্নং দুষ্কুলাদপি। মানিক যেখানেই পাবে যত্ন ক'রে কুড়িয়ে নেবে। তুমি তো খালি পথের মাণিক।"

"এ তুমি কি বলছো? কি করে জানলে, আমার কী পরিচয়?"

"আচ্ছা, সে ভাবনা তো তোমার নয়? এখন ওঠো তো, অনেক রাত্রি হয়েছে।

'ও' তাইতো বলেই অস্থির হয়ে পড়ে রাণী। তাড়াতাড়ি আশীষের হাত ছেড়ে চলতে স্থুরু করে।

"একি?" বাধা দিয়ে বলে আশীষ, "তুমি কি একা যাবে নাকি?"

"বা রে! লোকে কি বলবে তা না হলে?"

"যে যাই বলুক না কেন রাণী, আমি তোমায় এমনিভাবে রাস্তায় ফেলে ফিরে যেতে পারিনে। চল তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"বেশ চল।" কিছুক্ষন দু'জনেই নীরব। কেউ কোনো কথা বললে না। এমন সময় বেশ দূরের গ্রাম থেকে সানায়ের মধুর সুর ভেসে আসতে লাগলো তাদের কানে। আশীষ তন্ময় হ'য়ে শুধালো রাণীকে, "রাণী! ওটা কিসের সুর ভেসে আসছে শুনতে পাচ্ছ?"

তেমনিভাবে হাঁটতে হাঁটতে বললে রাণী, "পাচ্ছি, বিয়ে বাড়ীর সানাই বাজছে।"

"বিয়ে বাড়ীর সানাই ?" বলে কি যেন একটু ভাবে আশীষ। আবার দুজনে নীরবে হাঁটতে থাকে। খানিক পরে আবার আশীষই বললে, "জানো রাণী, লোকে কথায় বলে কারো পৌষ মাস আবার কারো সর্ব্বনাশ। আজ তোমার অবস্থা দেখে আমার কিন্তু সেই কথাটি বারবার মনে পড়ছে। আজ ঐ মেয়েটার সঙ্গে তোমার মনের অবস্থা তুলনা করে দেখ, কত প্রভেদ।"

"কিছুক্ষন আগে এই শানাইয়ের সুরে আমারও তাই মনে হয়েছিল কত প্রভেদ ঐ মেয়েটার সঙ্গে আমার জীবনের। কিন্তু এখন নেই।" বেশ সহজভাবে কথাটি বলে হাঁটতে থাকে রাণী। এ বলার মধ্যে কোন সংকোচ নেই, কোন দ্বিধা নেই, কোন লজ্জা নেই। যেন এই কথাটি বলা তার প্রয়োজন, তাই সে জানালো আশীষকে। নির্জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে দু'জনে পাশাপাশি। জ্যোৎস্নায় তাদের সর্বাঙ্গ ছেয়ে গেছে। রাণীর এরকম কথায় বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে যায় আশীষ। শুধু আশ্চর্য নয়, কৌতুহলও হয়। হাঁটতে হাঁটতে রাণীর দিকে একবার তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, "কেন ?"

"আজ আমি এমন জিনিষ পেয়েছি, যা সব-চাওয়া পাওয়ার অনেক ওপরে।"

আশীষ দেখলো রাণী বেশ গম্ভীরভাবে বলে যাচ্ছে। কিন্তু একি ? তারা যে একেবারে খিড়কীর দরজার কাছে এসে গেছে ! "আচ্ছা [illegible] আসি কেমন ?" বলেই আশীষ পিছন ফিরলো।

"[illegible]নো," ডাকলো রাণী অতি মৃদুকণ্ঠে। আশীষ ফিরে দাঁড়াতেই

রাণী গলায় আঁচল দিয়ে গড় হয়ে তার পায়ের উপর প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো। আশীষ অবাক হয়ে চেয়ে রইলো।

"কৈ, আশীর্বাদ করলে না ?"

"ও!" চমক ভাঙলো আশীষের। সে কিছু বলবার আগেই চেয়ে নিলো রাণী আশীর্বাদ, "যেন সব কিছু সয়ে থাকতে পারি তোমার জন্যে। আর একটা কথা, আজকের এই কথা মনে থাকবে তোমার ? মুগ্ধ হেসে উত্তর দিতে যাবে আশীষ, এমন সময়ে কে যেন গলার শব্দে তাদেরই সতর্ক করতে চাইলো। আশীষের কথা আর শোনা হলোনা রাণীর, ভয়ে সে তাড়াতাড়ি ঢুকে গেল বাড়ীর ভিতর।

চার

"আচ্ছা তুই কি বলতো নিখিল? এমনি করে গাঁট্টা মারতে তোর লজ্জা করে না? রাস্কেল, ইডিয়ট কোথাকার," বলে আশীষ ক্রোধান্বিত হয়ে তার গাঁট্টা খাওয়ার জায়গাটায় হাত বুলাতে বুলাতে বিরক্ত হয়ে চেয়ারটা একটু টেনে সরে বসতে গেল। চেয়ারের হাতল ত্বটো ধরে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনী দিলে নিখিল। সঙ্গে সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠলো প্রাণখুলে। বললে, "গাঁট্টা মেরেও তো তোর ধ্যান ভাঙাবার কোন উপায় দেখছিনে। কি হয়েছে তোর?" বলে নিখিল আশীষের চেয়ারের হাতলের উপর জুৎসই করে বসে গালে হাত দিয়ে ঝুঁকে পড়লো আশীষেরই মুখের উপর। "আমিও তাই ভাবছি নিখিল। ওটা কেন হঠাৎ এমন গম্ভীর হ'য়ে গেলো, বলেই স্থখেন তার মাথায় টোকা মেরে তারই সামনে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো। ঘরের আর একটা কোণ থেকে বলে উঠলো শ্যামল সহজভাবে—কি যেন লিখতে লিখতে,—"আমি যা ভেবেছি, বোধ হয় তাই হয়েছে আর কি।"

"কি ভেবেছিস? কি হয়েছে", বলে ওরা এগিয়ে এলো শ্যামলের কাছে। তেমনিভাবে লিখতে লিখতে বললে শ্যামল, "সচরাচর এ বয়সে যা হয় আর কি, মানে—ও প্রেমে পড়েছে।"

"আই সি!" বলে চোখ ত্বটো কপালে তুলে ব্যাঙের মত লাফিয়ে উঠলো নিখিল—সঙ্গে সঙ্গে স্থখেনও। শুধু লাফিয়েই ক্ষান্ত হলো না ওরা, হুড়মুড় করে আশীষের ঘাড়ে গিয়ে পড়লো ত্ব'জন। "কিরে? কি শুনি? কোর্টসিপ্ কার সঙ্গে?"

বিরক্ত হয়ে আশীষ ওদের এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বললে, "যা—যা ইয়ার্কি করিসনে।"

"এটা কি ইয়ার্কির কথা হলো,—না এটা ইয়ার্কির সময় ?" "আচ্ছা বলতো আশীষ,—সত্যিই ঠাট্টা নয়, এ ব্যাপারে তোকে আমরা কোনো হেল্‌প্‌ করতে পারি কি না ?" বলে উঠে সুখেন।

"হেল্‌প্‌ করতে পারি কি না, আবার শুধোচ্ছিস কি ? হেল্‌প্‌ করাটা যে আমাদের উচিত। শুধু উচিত নয় কর্তব্যও। যেহেতু আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকেরই আন্তরিক ফ্রেণ্ড। আমাদের চোখের সামনে ঐ হতভাগা লাভ-ম্যারেজ করতে গিয়ে প্রেমের সাগরে—অথই জলে দিশে না পেয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, আর আমরা অপদার্থরা থাকতে তার এই জীবন-মরণ সমস্যা দেখব চোখ দিয়ে ? মরণ আর কি ?" বলে হাতের পেনটা বন্ধ করে পকেটে ভরতে ভরতে হঠাৎ আশীষের মুখোমুখী বসে, গম্ভীর হয়ে শ্যামল বলল, "সত্যিই আশীষ ঠাট্টা নয়। বল্‌তো ব্যাপার কি ?"

"বেশ ভাবনায় পড়েছি ভাই।" গম্ভীর হয়ে বললে আশীষ।

"সেতো বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সে ভাবনাটা কাকে নিয়ে ?"

"একটী অনাথা মেয়েকে নিয়ে।"

"একটী অনাথা মেয়েকে নিয়ে সেই কথাটাই পুনরায় বেশ সুস্পষ্ট করে গাম্ভীর্যের সঙ্গে উচ্চারণ করলে শ্যামল, পর মুহূর্তেই এক শক্তিশালী আবিষ্কারকের মত বললে, "কিন্তু, ব্রাদার, তোমার না-বলা কথাটি বলে দিই, তা হ'লে ?"

"কি ?"

"মেয়েটি খালি অনাথাই নয়, অবশ্যই সুন্দরী ?"

আশীষের মুখে ফুটলো এক হাসির রেখা যা শুধু সুস্মিত নয়, সলজ্জও বটে।

"ব্যস্, ব্যস্, ঐ যথেষ্ট, হাস্যং সম্মতিলক্ষণং তা এর জন্যে এত ভাবনা কিরে ? তুই অনাথার নাথ হয়ে ভাবনাটা ঘুচিয়ে দে।"

"অনেক ভেবে দেখেছি। ইচ্ছে থাক্‌লেও সে সম্ভব নয় ভাই।"

"ওরে বা—বা! ইচ্ছে থাক্‌লেও সম্ভব নয় ? মাই গড্ শ্যামল, এর কথার ভাবে যেন কেমন কেমন গন্ধ লাগছে না ?" গলা ভারী করে বলে উঠল সুখেন। সেই মুহূর্তে শ্যামলের ধমক খেয়ে চুপ হয়ে যায় সে।

"কেন, অসম্ভবের কি হ'লো শুনি ?"

"আমি বেকার তা জানিস্। দাদা বৌদির সাহায্য ছাড়া যার উপায় নেই, সে কি করে আর একজনের ভার নেবে ?"

"নেয়, নেয়, তাও নেয়। লাভম্যারেজে অসম্ভবও সম্ভব হয়। এখানে জাত অজাত, সুন্দর, অসুন্দর, বেকার অ-বেকারের কথা ভেবে কেউ এগোয় না—রাস্কেল, কেউ এগোয় না। এটা হচ্ছে অন্তরের টান, যাকে বলে……'

"আঃ সুখেন কি হচ্ছে ?" বলেই শ্যামল এবারও সুখেনকে ধমক দিয়ে আশীষকে শুধোলে, "তাহলে তুই কি বলতে চাস্ এখন ?"

"এই অনাথা মেয়েটিকে একমাত্র তুই রক্ষা করতে পারিস্ ইচ্ছা করলে ?"

"আমি ?"

"হ্যাঁ, তুই।"

"কি করে শুনি ?"

"তুই এই মেয়েটাকে বিয়ে কর্ শ্যামল। তোরই উপযুক্ত এই মেয়ে। তুই বিশ্বাস কর, সত্যি মেয়েটি খুব সুন্দরী।"

"একেবারে যাকে বলে অপ্সরী ?"

"হ্যাঁ।"

"ওরে বাবা, অপ্সরী টপ্সরীদের আমার যা ভয়।"

"একথা বলিস্ কেন শ্যামল? তোর ত চিরদিনই সুন্দরের উপর লোভ আছে।"

"সুন্দরের উপর লোভ আমার এখনও আছে। সে শুধু মানুষ নয়। ঘটি-বাটি, পশু-পাখী, গরু-বাছুর সব কিছুর উপরই। লোভ থাকবে বলেই যে বিয়ে করতে হবে তার কোনো মানে নেই। আমি জীবনে বিয়েই করবোনা।"

"তুই তো জানিস্ না মেয়েটি বড় লক্ষ্মীও।"

"তা হোক্।"

"আ—হা—হা—হা বাহাদুর ছেলে বটে—বাহাদুর ছেলে বটে।" বলেই নিখিল বিরাশীমন ওজনে শ্যামলের পিঠে এক কিল বসিয়ে দিয়ে বললে, "এত সাধতে হচ্ছে কেনরে ষ্টুপিড্। তোর মত আইবুড়ো চাকুরেকে। হুঁঃ, কি বল্‌বো আর সাতটা বছর আগে যদি আশীষ এই প্রস্তাবটা করতো, তবে কি আর ঐ হতভাগাকে খোসামোদ করতে হতো? একবার দেখিয়ে দিতাম কি করে প্রেমের মর্যাদা রাখতে হয়।" এই ফাঁকা আস্ফালনের মধ্যে নিখিলের মুখে যে আপশোষ ফুটে উঠলো তার মূলে ছিল তার যে নাতি-দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের বিড়ম্বনা। সে খবর কারুর কাছে পৌঁছল না।

নিখিলের কথায় কান না দিয়ে বললে শ্যামল, "তোর সঙ্গে মেয়েটির জানাশোনা হ'লো কেমন করে? কোনদিন তো বলিস্‌নি তার কথা?"

"বলবো বলবো করে আর বলা হয়নি ভাই।" বলে আশীষ সংক্ষেপে বলে যায় রাণীর কথা। "বড় অসহায়া মেয়েটি। বড় দুঃখী। দুনিয়ায় ওর কেউ নেই। শৈশবে মা বাবা দুইই হারায়। দূর

সম্পর্কের এক কাকা আশ্রয় দেয় লোক নিন্দার ভয়ে। এই অসহায়া মেয়েটির উপর কাকা-কাকীর অত্যাচার চলে পুরোদমে। নিষ্ঠুর অত্যাচারের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে বারো বছর বয়সে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। তারপর তার এক দূর সম্পর্কের মামার বাসায় আশ্রয় পায়। সেখানেও তার মামা-মামীরা তাকে ভাল নজরে দেখে না। এমনি দুঃখের ভেতর দিয়ে মামার বাসায় কেটে যায় বছর ছয়েক। তারপর তার মামা অর্থের লোভে ওর বিয়ে ঠিক করে এক অশিক্ষিত মাতালের সঙ্গে। যেদিন ওর বিয়ে, সেদিন রাত্রেই ওদের পাড়ার এক শুভাকাঙ্ক্ষী ভদ্রমহিলার সঙ্গে অন্ধকার পথে বেরিয়ে পড়ে সে। তারপর এই হুগলীরই এক জঙ্গলের পথে দাদা বৌদি দেখতে পান মূর্ছিত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে। সেই অবস্থায় ওকে আনা হয় তাদেরই বাড়িতে। এখানে দাদা বৌদির কাছে ভালোই থাকতো— কিন্তু মাসীমা তা থাকতে দিলেন না। মাসীমার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে যমডোবায় যায় আত্মহত্যা করতে।" তারপর একটু থেমে বললে, "জানিস্, মেয়েটিকে আমি যমডোবা থেকে রক্ষা করেছি। তারপর বুঝিয়ে সুঝিয়ে পাঠিয়ে দিই দাদার ওখানে।" বীরত্বের সঙ্গে একটু মাথা ঝেঁকে বললে সুখেন, "তুই তো তার জীবনরক্ষা করে পাঠিয়ে দিলি বাড়িতে। কিন্তু তোর এ উপকার স্বরূপ মেয়েটী তোকে কিছুই বললে না?"

"কী আর বলবে ?"

"কেন, যে প্রাণে বাঁচালো সেই পরিত্রাতাকে—বিশেষতঃ, তিনি যখন একজন সুদর্শন যুবক—কত কিঁ তো বলা যায়? আরে পড়িসনি নভেল-টবেলে, দেখিসনি সিনেমায়—এই সব মুহূর্তগুলোই তো ডেন্‌জারাস্—মানে, সেন্‌সেসনাল্!"

"ওসব কিছুই হয় নি। শুধু যাবার সময় একটি প্রণাম করে চলে গেল।"

"ওরে বা—বা, একেবারে প্রণাম? বলি শুধু প্রণাম? আর কিছু নয়?"

"তুই সত্যি সুখেন, একটা আস্ত রাস্কেল। রাণীর ওসময়কার অবস্থা যদি দেখতিস।"

"রাণী? রাণী কে রে?" বিস্ময়ে অবাক হয়ে প্রশ্ন করে ওরা। নামটি বলে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে আশীষ, ওদের কাছে। আমতা আমতা করে বললে, "ঐ মেয়েটির নাম।"

আশীষের মুখের কথা শেষ না হতেই প্রচণ্ড হাসির হুল্লোড়ে শব্দায়িত সেই ঘরখানিতে আওয়াজ উঠলো,—"থ্রী চীয়ার্স ফর আশীষ কুমার! হিপ্ হিপ্ হুররে, হিপ্ হিপ্ হুররে, হিপ্ হিপ্—কে যেন বলে উঠলো, "গড্ সেভ্ আস্। নাম ধাম প্রণাম সব এর মধ্যে সমাপ্ত! তাহলে আর কোনো কথা নয়—কোনো কথা নয়। এবার বাকীটা সেরে ফেল্। কথায় বলে শুভস্য শীঘ্রম্। বেকার তাতে কী। একটা প্রবাদ আছে জানিস তো আশীষ, স্ত্রী ভাগ্যে ধন। সুতরাং স্ত্রীর ভাগ্যেই তোর বেকারত্ব ঘুচবে।" বলে তিন বন্ধুতে আশীষের কানটেনে, চুলটেনে, চেয়ার উলটিয়ে এক মুহূর্তে তাকে নাজেহাল করে তুললো।

পাঁচ

রাণী যা ভয় করেছিল, পরের দিন ঠিক তাই হ'লো। পাড়ায় পাড়ায় ইতিমধ্যে আশীষ ও রাণীর প্রসঙ্গ নিয়ে বেশ কাণাঘুষা চলতে লাগল।

মধ্যাহ্নে গৃহস্থালীর সকল কার্যাদি সমাধা করে, কুলবধূরা যখন কলসী কাঁখে গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে যেতো, এক সঙ্গে কাপড় কাচতো, তারাও মাঝে মাঝে হাতের কাজ বন্ধ করে, রাণী ও আশীষের ব্যাপারটা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত। কেউ বা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুচ্‌কি হাসি হাসত।

জগতে এমন জাতের কতগুলো লোক আছে, যারা দেখুক আর নাই দেখুক, বুঝুক আর নাই বুঝুক, তাদের কাজই হ'লো অপরের নামে কুৎসা রটনা—তিলকে তাল করে বলা—জগতের কাছে নিজেদের বাহাদুরী জাহির করা। একাজে যেমন তাদের উৎসাহ আবার তেমনি নাকি হয় তাদের মনের তুষ্টি। পাড়ার শ্রীমন্ত ঠাকুরের মাও ছিলেন ঠিক এই ধরণের মানুষ। গঙ্গার ঘাটে সেই সময় তিনি স্নানে এসে ছিলেন। কথাগুলি শুনে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাই তাড়াতাড়ি ঝপাঝপ্ কয়েকটা ডুব দিয়ে ভিজে কাপড়ে সোজা ছুটে এলেন প্রণবের মার কাছে। উদ্দেশ্য—কথাগুলো তার কাণে লাগানো। শ্রীমন্ত ঠাকুরের মা ও বিন্দিঠাকুরাণী উভয়েই সমবয়সী ছিলেন, এবং পাড়ার মধ্যে এঁদের দুজনের মধ্যে বেশ মিলও ছিল। তাই তাঁরা উভয়ে উভয়কে কখনও সই কখনও বা দিদি বলে সম্বোধন করতেন। তখন বিন্দিঠাকুরাণী সবে মাত্র তাঁর খাওয়া শেষ করে

বারান্দায় একটী জলচৌকিতে বসে রোদের দিকে পিঠ রেখে খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিলেন। শ্রীমন্তর মাকে এমন সময় দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "কি গো? এমন অসময়ে—আবার ভিজে কাপড়ে?"

"আর থাক্‌তে পারছিনে দিদি।" বলে সে বিন্দিঠাকুরাণীর সামনাসামনি এসে দাঁড়াল।

"থাকতে পারছোনা মানে?"

"পথে ঘাটে ঘরে বাইরে,—পাড়ার সকল জায়গাতে একেবারে ঢিঢি পড়ে গেছে।" উত্তর করলে শ্রীমন্তর মা।

বিন্দিঠাকুরাণী একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "বলি ব্যাপার কি? খুলেই বলনা?" এই বলে জিজ্ঞাসু নেত্রে বড় বড় করে তাকালেন তিনি শ্রীমন্তর মার দিকে।

খেলা দেখাবার সময়ে চতুর যাদুকর যেমন মাঝে মাঝে অল্প অল্প করে নিপুণ ভাবে আপনার বক্তব্য দর্শকদের বলে থাকে ঠিক্ সেই ভাবে, সেজে ঢেলে, একটু একটু করে, শ্রীমন্তর মাও বলতে লাগলেন বিন্দিঠাকুরাণীকে,—"সেই জন্যেই তো ছুটে এলাম। হাজার হোক্ তুমি আমার সই। তোমার মুখ নীচু হয় এমন কিছু দেখলে কি আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি। এ ঘোর কলিকাল, দিদি, এ ঘোর কলিকাল। নিজের চোখে এমন দেখবো, তা কে ভেবেছে বল? এ বললেও পাপ, শুনলেও পাপ।" এই বলে দু'টো আঙ্গুল কাণে দিয়ে সাঁচায় মিছায় তিলকে তাল করে প্রণবের মার কাণে বিষ ঢেলে দিলেন।

অধীর হয়ে বিন্দিঠাকুরাণী জিজ্ঞেস করলেন, "আসল ব্যাপারটা তো কিছুই বললে না সই?"

"তাই তো বলছি। সেই তোমাদের ভালমানুষের মেয়ে আর আশীষ গো! যাদের তুমি এতকাল ধরে দুধ কলা দিয়ে পুষে আসছ, সেই দুই সাপ। ছিঃ, ছিঃ, রাম! আমি তো তখনই তোমাকে বলেছিলাম দিদি, এসব হ'লো পথ-কুড়োনো ছেলে মেয়ে। কখনও কি এদের স্বভাব চরিত্র ভাল থাকতে পারে—না জাতের হয়। এ বয়সে কত দেখলুম, কত শুনলুম, আমি জানিনে ?" এই বলে মুখ ঘুরিয়ে অবজ্ঞার হাসি হাসলেন শ্রীমন্তর মা।

"বলি হতভাগীর কি দড়িকলসীও জুটলোনা?" অগ্নিশর্মা হয়ে বলে উঠলেন বিন্দিঠাকুরাণী।

"আমিও তো তাই ভাবছি," সোৎসাহে বলে উঠলেন শ্রীমন্তর মা, "স্বচক্ষে দেখা। সদর রাস্তা দিয়ে, সন্ধ্যে বেলা দু'জনে ঢলাঢলি করতে করতে—" এইভাবে এক অর্থপূর্ণ চাপা-সুরে সেই বর্ষীয়সী মহিলাটি বেপরোয়া কল্পনার আশ্রয়ে তাঁর প্রিয় সখীর মুখরোচক আশীষ ও রাণীর নানা চিত্র প্রত্যক্ষদ্রষ্টার ভূমিকায় একে একে উদঘাটিত করে গেলেন। আবার উস্‌কানি দিয়ে বললেন, "এক কাজ কর দিদি, এই কুলটা পোড়ারমুখীকে দূর করে দাও বাড়ী থেকে। তা নাহলে আর পাড়ায় মুখ দেখাতে পারবে না।"

"তুমি ঠিকই বলেছ সই, আমি যদি ঐ বজ্জাত মেয়েটাকে তিন দিনের ভেতর বাড়ী থেকে না তাড়াই তা হ'লে আমার নাম বিন্দিঠাকুরাণী নয়।" শ্রীমন্তের মাকে এই বলেই তিনি জলচৌকি থেকে সরোষে গর্জাতে গর্জাতে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লেন। শ্রীমন্তের মার আর কোনো কথার অপেক্ষা না করে সোজা প্রণবের ঘরের দিকে ধেয়ে গেলেন। শ্রীমন্তের মা বিন্দিঠাকুরাণীর বিষাক্ত মন আরও বিষাক্ত করে দিয়ে প্রশান্ত মনে ঘরে ফিরে এলেন।

পরে জানা গেছে, সেদিন তাঁর সেই কড়কড়া আলো চালের শুকনো ভাতগুলো নাকি অমৃতের মতো মধুরাস্বাদী বলে মনে হয়েছিল।

ছয়

ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়েছিল প্রণব। ঘণ্টা খানেক হ'লো ফিরে এসেছে সে রোগী দেখে। হাতে একখানা বই। খুব মনোযোগ সহকারে তাই দেখছিল।

"বলি পানু ও পানু, ঘরে আছিস?" গুরুগম্ভীর ভাবে হাঁক দিলেন বিন্দিঠাকুরাণী। মার গলার স্বর শুনে বইখানা হাতে করেই বেরিয়ে এলো প্রণব। "আমায় কিছু বলবে মা?

"কী কেলেঙ্কারী শুনেছিস?"

"কেলেঙ্কারী? কিসের?"

ঐ যাকে তোরা দুটিতে ভাল মানুষের মেয়ে মনে করে পুষছিস্!" ব্যাপারটা যে কিভাবে গড়িয়েছে তার বিন্দুবিসর্গও জানতো না প্রণব। রোজই যেরূপ ঘটে থাকে তাদের সংসারে আজও ঠিক সেইরূপ একটা কিছু হয়ে থাকবে মনে করে প্রণব জবাব দিলে, "ও কেলেঙ্কারী তো রোজই হচ্ছে এ আবার নোতুন কি?"

বিস্মিত হ'য়ে খেপে উঠলেন বিন্দিঠাকুরাণী। "এসব তুই কী বলছিস? তা হলে তুই সব জানিস।"

"না জানবার কি আছে মা!" পুনরায় প্রণব বইএর পাতা উল্টাতে উল্টাতে উত্তর করলে, "আর সবাইকে নয় অবিশ্বাস করা যায়, কিন্তু নিজের কানকে তো অবিশ্বাস করা যায় না।"

কাঠের উপর কেরোসিন ঢেলে অগ্নি সংযোগ করলে আগুন যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে, প্রণবের উক্তিতে ঠিক সেই ভাবে জ্বলে উঠলেন বিন্দিঠাকুররাণী।

"এত সব জেনে শুনে নিশ্চিন্ত মনে এখনও চুপ করে বসে আছিস, হতভাগা ছেলে !"

বেশ সহজভাবে জবাব দিলে প্রণব, "কই নিশ্চিন্ত হতে পারছি মা। রাণীকে একটি ভাল পাত্রের হাতে না দেওয়া পর্যন্ত আমি কোনো দিনই নিশ্চিন্ত হতে পারবোনা।"

খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি। "সে পাত্র দেখবার তোর আর আবশ্যক আছে কি ? পাত্র তো ও নিজেই ঠিক করে ফেলেছে।"

বই থেকে মুখ তুলে একটু বিরক্ত হয়ে বললে প্রণব, "এমন আজগুবি কথা তোমাকে কে বললে মা ?"

প্রণবের উক্তিতে ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন তিনি। "আমায় অবিশ্বাস করছিস ? আমি ভালো করে না জেনে শুনে কি তোকে এমন কথা বলছি ? ডাকবো শ্রীমন্তর মাকে ? শুনবি তুই তার মুখে ?"

শ্রীমন্তর মা যে স্বভাবে তার মায়েরই জোড়া—তা অবিদিত ছিলনা প্রণবের। কিন্তু আজ সত্যি সে একটি নিরপরাধ মেয়ের নামে মিথ্যে অপবাদ সইতে পারলনা। নীরবে মায়ের অনেক অত্যাচারই এতদিন সহ্য করে এসেছে।

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে যে ছেলে এতদিন একটি কথা বলেনি, সেই মাতৃভক্ত ছেলে প্রণব আজ অতি সহজেই ফস্ করে মায়ের মুখের উপর তীক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, "আমি কারও সাক্ষী শুনতে চাইনে মা। আমার সে সখ নেই। আমি কোনদিনই বিশ্বাস করবো না যে রাণী এমন—"

বিন্দিঠাকুরাণীর হৃদয় দাবানলের মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। "কি ? তুই আমাকে অবিশ্বাস করলি ? আমাকে অপমান করলি ?" বলেই তিনি হাঁপাতে থাকেন। পুনরায় শাসিয়ে বললেন, "আমারও শেষ কথা তুই শুনে রাখ্ প্রণব ! আমি তিনদিন সময়

দিলাম। এ তিন দিনের মধ্যে যদি তুই ঐ কুলটা বজ্জাত মেয়েটাকে বাড়ী হতে না তাড়াস্ তা হলে আমি নিজেই ওকে ঝাঁটা মেরে তাড়াবার ব্যবস্থা করবো।" এই বলে রাগে গর গর করতে করতে ঝড়ের বেগে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মায়ের হুকুম শুনে, লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে প্রণব। আরো দুটি প্রাণী প্রণবের বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে রইল প্রণবেরই মত হতবাক্ হয়ে।

বিন্দিঠাকুরাণী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাণীর সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো। দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তি যেন আর নেই তার, কে যেন তার শরীরের সমস্ত শক্তি, সমস্ত বল, সমস্ত জোর নিংড়ে শুষে নিয়ে গেল এক মুহূর্তে। অসহায় ভাবে প্রণবের দিকে তাকিয়েই "মাগো" বলে বুক ফাটা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

"একি হলো—একি হলো" বলে বীণা ও প্রণব রাণীর মূর্চ্ছিত দেহ-খানা ধরাধরি করে খাটের উপর তুলে 'জল জল' বলে চেঁচামেচি করতে লাগলো।

সাত

কঠিন-হৃদয় বিন্দিঠাকুরাণীর কঠোর হুকুমে, প্রণব ও বীণার শিরে যেন বজ্রাঘাত হল। মা হ'লে কি হবে, রাণীর প্রতি স্নেহ মমতা বলে বিন্দিঠাকুরাণীর অন্তরে বোধহয় কিছুই ছিলনা। তা না হ'লে নিঃস্ব অসহায় একটা মেয়ের উপর, নির্বিকারে, অসঙ্কোচে বারংবার এরূপ রূঢ় ব্যবহার করছেন কি করে! কেউটে সাপের মতো রাণীকে 'কুলটা' বলে দংশন করে, রাণীর মনে, প্রাণে—সর্বশরীরে হলাহল ছড়িয়ে দিয়ে, তাকে পলে পলে, তিলে তিলে, তুষানলে দগ্ধ করার প্রবৃত্তি হলো কি করে তাঁর! বিন্দিঠাকুরাণীর যে কথা সেই কাজ। পান থেকে চূণ খসবার উপায় ছিল না। কাজেই তাঁর কথা নড়চড় হলে, যে ভয় দেখিয়েছেন তিনি, রাণীর অবস্থাটা যে ঠিক সেই হবে. এই ভয়ে প্রণব ও বীণা উভয়ে রাণীর জন্যে শঙ্কিত হয়ে উঠল। সেদিন রাণীকে সুস্থ রেখে, হঠাৎ একটি জরুরী 'কলে' প্রণব রোগী দেখতে বের হয়ে গেল বাড়ী থেকে। বীণা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ও বিষন্ন মনে হেঁসেলের কাজে মন দিলে। ঠিক এমনি সময় আশীষ এলো। বৌদি বলে বীণাকে ডাক দিয়েই বীণার উত্তরের অপেক্ষা না করে হেঁসেলে প্রবেশ করলে। একখানা জলচৌকি এগিয়ে দিয়ে আশীষকে বসতে বলে মনে মনে তখন রাণীর অবস্থাটা ভাবছিল বীণা।

বীণাকে এরূপ নীরব থাকতে দেখে সেদিনের ঘটনা স্মরণ করে শঙ্কিত হয়ে ওঠে আশীষের মন। সশংকিত ভাবে বীণাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কি ভাবছো বৌদি ?"

এগিয়ে এসে হঠাৎ আশীষের দুখানা হাত চেপে ধরে কাতর কণ্ঠে

বললে বীণা, "আমার একটি কথা রাখবে ঠাকুরপো ?"

এমনিভাবে ব্যাকুল হয়ে বীণা তার হাত ধরে কোনো দিনই কোনো কথা বলেনি। তাই একটা অজানা আশঙ্কায় আশীষের বুকখানা কেমন যেন টিপ টিপ করতে লাগল।

"কি কথা বৌদি ?" প্রশ্ন করলে আশীষ।

"বল, রাখবে আমার কথা ?"

"রাখার ক্ষমতা হ'লে নিশ্চয়ই রাখবো। কোনোদিনই তো তোমার অবাধ্য হইনি," জোর দিয়ে বললে আশীষ।

আশীষের হাত দুখানা ছেড়ে দিয়ে বীণা বললে "তোমাকে জানি বলেই একথা বলতে সাহস করছি। তুমি রাণীর ভার নাও, ঠাকুরপো।"

বীণার কথাতে সেদিনের ঘটনা মনে করে আশীষের মনে যে একটা অন্য আশঙ্কার ছায়া উঠেছিল তা দূর হয়ে গেল। একটু ভেবে গম্ভীর ভাবে বলে উঠল আশীষ, "বিয়ে করা তো এখন সম্ভব নয় বৌদি।"

"কেন সম্ভব নয় ? রাণী কি তোমার অনুপযুক্ত ? তা ছাড়া তোমার দাদারও ইচ্ছে তোমার হাতেই রাণীকে তুলে দেন।"

প্রণবের নাম উল্লেখ করতেই থতমত খেয়ে উত্তর করলে আশীষ, "না—না—না অনুপযুক্ত হবে কেন ? সে কথা বলছিনে।" বলেই প্রণবের উপকার ও সাহায্যের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতায় আর্দ্র হয়ে উঠলো তার কণ্ঠস্বর।

"বৌদি, আজ যে দুতিনটে ডিগ্রি পেয়ে বের হয়েছি সে কেবল তোমার আর প্রণবদার অনুগ্রহে। মা বাবাকে হারিয়ে যেদিন তোমার দ্বারে এলাম, সেদিন তুমি ও প্রণবদা সহোদর ভাইয়ের মত টেনে নিয়েছিলে তোমাদের কাছে। লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছ তোমরাই। তোমাদের এ ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারবো কিনা জানি না।"

একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে উঠল বীণা, "সে সব অতীতের কথা অতীতেই মিশে গেছে। ও সব কথা এখন কেন তুলছ ঠাকুরপো ? আমি সত্যি বলছি, এমন একটী মেয়ে কেউ তপস্যা করেও পায় না।"

"সে আমি জানি বৌদি।"

"তবে অমত কেন করছ ?"

"আমি বেকার। থাকি একটা মেসে। সামান্য টিউসানি করে যা পাই আর তোমাদের সাহায্য—এতে কোন রকমে দিন যাচ্ছে কেটে।"

"এই জন্যেই কি তুমি অমত করছ ঠাকুরপো ?"

অস্পষ্ট একটা সঙ্কোচের সুর বেরিয়ে এলো আশীষের অবনত মুখ থেকে।

"সে তোমার ভাবতে হবে না। সে সব ভাবনা আমার। তুমি মত দিলে আমি একাজে এগোতে পারি। আমাকে হতাশ করোনা! আমার কথা রাখ। তুমি তো রাণীকে জান। ফুলের মত ওর নিষ্পাপ চরিত্র। তুমি আর অমত করোনা ভাই।"

এই বলে সংক্ষেপে বিন্দিঠাকুরাণী রাণীকে কুলটা ইত্যাদি বলে গালিগালাজ দেবার ঘটনা ও রাণীর অবস্থা আশীষকে জানালে।

আশীষ চুপ ক'রে একে একে বীণার সমস্ত কথাই মন দিয়ে শুনল। তারপর বীণার অনুরোধ, প্রণবের ইচ্ছা, রাণীর মর্মান্তিক অসহায়তা, সে দিনের নিভৃত আলাপের নানান সুরের মূর্চ্ছনা—একের পর এক এসে আশীষের হৃদয়াকাশে আলো-ছায়ার দোলা জাগিয়ে তুললো। তাকে এমন তন্ময় হতে দেখে বীণা শেষ বারের মতো জানতে চাইলে, "তাহলে ঠাকুরপো ?"

"তোমার কৃপায় যখন ভেসে যেতে যেত কূল পেয়েছি, তখন তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্ বৌদি।"

মেঘমুক্ত আকাশের ছবি ঝলমল করে উঠ্‌লো বীণার মুখমণ্ডলে

আশীষের শেষ কথাটিতে। তার মনের কোণে দুশ্চিন্তার জমাট-মেঘখানি মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। বীণার বিষণ্ণ বদন আবার আনন্দে প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল। তাই আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠল আশীষকে, "তা হলে শোনো ভাই, কলকাতায় তোমার দাদার এক বন্ধুর নিজের বাড়ী আছে। তিনি বাড়ীটা ভাড়া দিতে চান। আমাদের ইচ্ছে ঐ বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা সেইখানে করে ফেলি। যে পর্যন্ত তুমি চাকরী না পাও, সে পর্যন্ত সমস্ত ভার রইল তোমার দাদার উপর।"

বীণার কথায় বিস্মিত হয়ে বললে আশীষ, "কিন্তু এ কী করে হয় বৌদি! সে যে অনেক টাকার দরকার।"

"তা হোক্ ভাই। ভগবানের আশীর্বাদে খরচ চালাতে আমাদের একটুও কষ্ট হবে না।"

তবুও ইতঃস্তত করে আশীষ।

"এতে ইতঃস্তত করবার কিছুই নেই। বেশ তো, তুমি বিয়ে করে ঠিক হয়ে বসো। তারপর চাকরী পেলে আবার সব শোধ করে দিও। তখন হাসিমুখে আমরা নেব। এখন ধারই না হয় নাও।"

"তোমাদের ঋণ বোধ হয় কোনদিনই শোধ করতে পারবোনা বৌদি," কৃতজ্ঞতায় বলে উঠল আশীষ।

"আবার ওসব কথা?" ধমক দিয়ে ওঠে বীণা, "তুমি বসো, চা খেয়ে যাও। রাণী!!"

জলচৌকি থেকে শশব্যস্তে লাফিয়ে ওঠে আশীষ। লজ্জিত হয়ে বললে, "না না বৌদি, এখন যাই। আবার আসবো।"

"হ্যাঁ এখন আসবে বৈকি!" হাসতে হাসতে ঠাট্টা করে বললে বীণা। মুখখানা যেন না লুকালেই নয়, এমন ভঙ্গীতে বড়ো বড়ো পা ফেলে বেরিয়ে গেল আশীষ।

আট

বিয়ের পর আশীষ অনেক অনুসন্ধান করে শ্যামবাজারে একটা দোতলা ফ্ল্যাটে দু'খানা মাঝারি রকমের ঘর ভাড়া করে, রাণীকে নিয়ে নোতুন সংসার পাতল। দেখতে দেখতে প্রায় এক বছর কেটে গেছে। আশীষ আজ পর্য্যন্ত বহু ঘোরাঘুরি করে—বহু অনুরোধ উপরোধ করেও চাকরীর জোগাড় করে উঠতে পারেনি।

সেদিন প্রায় সন্ধ্যে হয় হয়। দিনমণি ম্লান মুখে অস্তাচলে ঢলে পড়েছে। এমনি সময় আশীষ ক্লান্ত দেহে ফিরে এলো বাসায়। বের হয়েছিল চাকরীর চেষ্টায়। কিন্তু কোন সুবিধা করতে পারেনি। বাসায় ফিরে হাত পা ধুয়ে, একখানা চেয়ার টেনে হতাশ হয়ে বসে পড়ল আশীষ। হাতে একখানা খবরের কাগজ—যে কাগজ খানায় বিজ্ঞাপন দেখে সে গিয়েছিল চাকরীর চেষ্টায়। সেই পুরানো কাগজখানাই পুণরায় চোখের সামনে খুলে ভাবতে থাকে সে চাকরীর কথা। রাণী ঘরের এককোণে স্টোভ জ্বালিয়ে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। মাথার রাশিকৃত চুলের গোছা পিঠে এবং গোলাপী রঙের মুখখানার উপর এলো-মেলো ভাবে ছড়ানো। ঢেউ তোলা, কালো কালো, কোঁকড়ানো, ছোট বড় চুলগুলো দুরন্ত পাগ্‌লা হাওয়ায় বারবার মুখে চোখে এসে তাকে বড়ই বিব্রত করে তুলছিল। বিরক্ত হয়ে কাজের ফাঁকে ফাঁকে হাত তুলে অবাধ্য চুলগুলো পেছন দিকে সরিয়ে দিচ্ছিল বারেবারে। ওরই মাঝে হঠাৎ হাতের কাজ বন্ধ করে কি যেন ভাবছিল আনমনা হ'য়ে। হয় তো ভাবছিল

আশীষেরই কথা। এরই মধ্যে আবার মুখ ফিরিয়ে চুলের রাশি সরিয়ে দিতেই দৃষ্টি গেল আশীষের দিকে। দেখলে, অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আশীষ তারই মুখপানে।

বিয়ের পর থেকে এই দুজন বেশ সুখেই ছিল। তবুও সময় সময় রাণীর মনে শংকা জাগতো আশীষের চাকরী না হওয়াতে। তাই মাঝে মাঝে রাণীকে বড়ই বিমর্ষ দেখাত। সাধারণতঃ মেয়েরা হয় কষ্টসহিষ্ণু। তারা স্বামীর সুখ সুবিধার দিকে তাকিয়ে হাজার অসুবিধা সইতে পারে মাথা পেতে। রাণীও ছিল সেই প্রকৃতির। আশীষ তাকে বিয়ে করে ঘরে আনার পর থেকে সে মনে মনে সর্বদা আশীষের কাছে নিজেকে চিরকৃতজ্ঞ বলে মনে করত। আজ আশীষ যে চাকরীর চেষ্টায় এত কষ্ট করে ঘোরাঘুরি করছে এও তো তারই জন্যে। একথা মনে হ'লেই রাণী নিজেকে আশীষের কাছে অপরাধী বলে মনে করত। এবং এর জন্যে সে সময় সময় বেশ ভাবত, আর মনমরা হ'য়ে বসে থাকত। আজও সে কাজের ফাঁকে তাই ভাবছিল। অনেক দিন থেকে রাণীর এ ভাবটা লক্ষ্য করে আসছে আশীষ। তাই আজ চেয়ার থেকে ধীরে ধীরে উঠে রাণীর চা'র সরঞ্জামের সামনেই মেজেতে ধপ্ করে বসে বলে উঠল, "আচ্ছা রাণী, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?"

আশীষের প্রশ্নে রাণীর বুকখানা কেন যেন টিপ্‌টিপ্ করে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে স্টোভ থেকে কেত্‌লিটা নামাতে নামাতে বলল, "কী কথা বলো ?"

চায়ের খালি কাপ ডিসগুলো দুহাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললে আশীষ, "আজ আমাদের বিয়ে হয়েছে এক বছর হলো। এই এক বছরের মধ্যে আমি কিন্তু লক্ষ্য করে আসছি,

তুমি যেন কি ভাবো। কেমন যেন সময় সময় মনমরা হয়ে বসে থাকো। কেন বলতো ?"

আশীষের প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লাজনম্রা বধূটির মতো ছোট্ট একটি জবাব দিলে রাণী, "কই—না তো।"

খুশী হতে পারলোনা আশীষ রাণীর জবাবে। তাই আবার ক্ষুণ্ণ মনে বলে উঠল, "আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করোনা, রাণী। জানো, তোমাকে বিষণ্ণ দেখলে, আমার কষ্ট হয়—," তারপর একটু থেমে বলল, "আমাদের ভবিষ্যত ভেবে সময় সময় এমন মনমরা হয়ে পড়ো—নয় কি ? কেন এত ভাবো ? কান্না হাসির এ সংসার। সুখ দুঃখ দিয়েই মানুষের জীবন গড়া। আমাদের এ দুঃখের রজনীর অবসান হবে বই কী। এত ভাবো কেন বলতো ?" বলেই আশীষ প্রেমার্দ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রাণীর পানে।

কিছু দিন থেকে যে কথাটা আশীষকে বলব বলব কোরেও রাণী এতদিন বলবার সুযোগ ও সাহস পায়নি আজ সে প্রসঙ্গটা আশীষ নিজেই তুললো দেখে একটু সাহস করে হঠাৎ আশীষকে বলল রাণী, "একটা কথা বলবো ?"

"কী কথা ?"

"রাগ করবে না তো ?"

"রাগ করবো কেন ?" বিস্মিত হয়ে বললে আশীষ, "কথাটি কি শুনি ?"

"বলছিলাম কি নীচতলার চারুদির সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছে। আ-হা চারুদি বেচারীর কী কষ্ট ! ওঁর কেউ নেই সংসারে। তাই কাগজ দিয়ে সুন্দর সুন্দর ফুলের মালা তৈরী করে বেশ দু'পয়সা উপায় করে। তাই বলছিলাম কি—" বলেই রাণী কথা অসমাপ্ত রেখে ইতস্ততঃ করতে থাকে।

রাণীকে ইতস্ততঃ করতে দেখে, রাণীর মনের কথাটা বুঝতে পেরে নিজেই বলে উঠে আশীষ, "ভাই তুমিও এভাবে মালা গেঁথে—বিক্রি করে তোমার বেকার স্বামীর অভাব দূর করতে চাও, কেমন তাই না ?" কেমন যেন একটু ভীত হ'য়ে পড়ে রাণী আশীষের কথার সুরে। আশীষ বলে যায়, "কিন্তু তুমি তো চারুদির মতো নও, তোমার স্বামী এখনও জীবিত।"

মুখ ভার করে রাণী বলে, "তা হলে তোমার মত নেই ?"

"না। এতে আমার একটুও মত নেই।" মাথা নেড়ে জানালো আশীষ।

"কেন অমত করছো ? এতো কোন খারাপ কাজ নয়। মালা গাঁথা কত সুন্দর কাজ। আমায় কাগজ এনে দাও। গেঁথে রাখবো মালা। চারুদি বিক্রি করে দেবেন। অবশ্যি চারুদিকে এর জন্যে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হবে।"

"না—গো—না। কাউকে কিছু দিতে টিতে হবে না," জোরে হাত মুখ নেড়ে অসম্মতি জানালো আশীষ। "তোমার হাতের তৈরী মালা আমি কখনও যেতে দেবোনা বাইরে," বলতে বলতে আশীষ রাণীকে টেনে আনলো তার সামনে। তারপর সতৃষ্ণ নয়নে তার মুখখানা দু'হাত দিয়ে তুলে ধরে বলল, "বলো না রাণী, কাটবে না এ আঁধার ? আমার এ মানিক যদি আঁধারেই এত জ্বলে, না জানি, ঘরে আলো এলে কি জ্যোতিঃ ঠিকরে বেরুবে এ থেকে—"

"চা যে ঠাণ্ডা হলো। তোমার খাবার—"

"থাক খাবার আর চা পড়ে," বাধা দেয় আশীষ, "আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। তা নাহলে ছাড়বোনা, কিছুতেই না," বলেই একটু দুষ্টু হাসি হেসে রাণীর দু'খানা হাত শক্ত করে চেপে ধরলে সে। আশীষের ছেলেমানুষীতে বিব্রত হয়ে পড়ল রাণী। আশীষ

বুঝতে পারলো রাণীর মনের অবস্থা, তাই ভয় দেখিয়ে বলে উঠল, "কী বলবে না ? তা হলে থাক এমনি ভাবে বন্দী হয়ে। আমিও তেমনি বটে। কিছুতেই ছাড়বনা। আসুক চারুদি, দেখে যাক আমাদের যুগলমূর্তি," বলেই আশীষ তাকে আরো জোরে আঁকড়ে ধরলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটু জোরেই হেসে উঠল।

সন্ত্রস্ত হ'য়ে চারিদিকে তাকায় রাণী। "ছাড়ো—ছাড়ো শীগগীর" বলেই সজোরে ঠেলে দিয়ে তার বাহুপাশ হ'তে নিজেকে মুক্ত করে সোজা পাশের ঘরে চলে গেল আশীষের খাবার আনতে।

নয়

আরো মাস ছয় কেটে গেছে।

দেওয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটা ঢং ঢং করে বারোটা বাজার সংকেতে নিদ্রিত রাণী খোকনের পাশ থেকে হকচকিয়ে লাফিয়ে ওঠে শয্যার উপর। চোখ দুটো ভাল করে রগড়ে তাকিয়ে নেয় ঘড়ির দিকে। চমকে ওঠে রাণী। . এত রাত হয়েছে। এখনও কেন বাসায় ফিরলো না আশীষ! চঞ্চল হয়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো সে। রাস্তার দিকে উদ্‌বিগ্ন হয়ে তাকিয়ে থাকে আশীষেরই প্রতীক্ষায়। কিন্তু কোথায় আশীষ? রাস্তায় মানুষের আনাগোনা যানবাহন চলাচল কখন বন্ধ হ'য়ে গেছে। এখনও কেন ফিরলো না! দেরী তো রোজই হয়। কিন্তু এত দেরী এ পর্যন্ত তো হয়নি! তবে কী কোনো—"

অজানা আশংকায় বুকখানা কেঁপে উঠল রাণীর। বারবার ঘর বা'র করতে লাগল সে। হঠাৎ খোকনের দিকে তাকালো। দেখলে খোকন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ভাল করে খোকনের গায়ে চাদর খানা ঢাকা দিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমে দাঁড়ালো। চারুদির ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। চারুদির ঘরে আলো দেখে তার মনটা যেন একটু হাল্‌কা হয়ে উঠল। ভেতর থেকে দরজাটা ভেজানো ছিল। রাণী নিঃশব্দে দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখলে, একমনে কাগজের মালা তৈরী করে যাচ্ছে চারুদি তখনও। হঠাৎ কি ভেবে রাণী তেমনি নিঃশব্দে বন্ধ করে দিলো দরজা। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে দাঁড়ালো সে ভিতরের দিকের বারান্দায়। বাড়ীখানার এই ভিতরের দিকটার আবহাওয়া আদৌ

প্রীতিকর নয়। যেন একটা বুকে-পাথর-চাপা বন্দী দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে কেবলই ঠেলে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করছে। নিজের মনে কত কি ভাবলো রাণী সেখানে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সে যেন একেবারে আজগুবি—আর ভেবে উঠ্‌তে পারছে না, তারও যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠল সে। এত রাত হয়েছে ? প্রায় দেড়টা বাজে ? নিঝুম রাত —রাস্তায় জন মানবের সাড়া নেই। কেবল কয়েকটা কুকুর রাস্তার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘেউ ঘেউ করে ক্ষ্যাপার মত ডেকে যাচ্ছে। নিঝুম রাতের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে রাণী আশীষের দেরী হওয়ার সম্ভব অসম্ভব হাজারো রকমের কারণ।

রাত প্রায় দুটো। এমন সময় পেছন থেকে সাড়া এলো,"একি ! তুমি এখনও ঘুমোওনি রাণী ?"

আশীষের সাড়া পেয়ে সচকিত হয়ে পেছন ফিরে তাকায় রাণী—ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসে তার পাশে। উদবিগ্ন হ'য়ে বললে সে, "এত দেরী হলো কেন তোমার ?"

পোষাক খুলতে খুলতে বললে আশীষ,"নানান ঝামেলায়। সে যাক্, তুমি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে বুঝি ?"

পোষাকটি আশীষের হাত থেকে তুলে নিতে নিতে বললে রাণী,"বা-রে, ব্যস্ত হবোনা ? তুমি বেশ কথা বললে। একা একা, এত রাত্তিরে ভয় করে না বুঝি ?"

"একা কেন ? নন্দর মা কই ?"

"জ্বর হয়েছে ওর। বাসায় চলে গেছে।"

"তোমার খাওয়া হয়নি ?"

"না।"

"কেন খাওনি ?'

"তুমি আসনি বলে।"

"আমার জন্যে না খেয়ে এত রাত পর্যন্ত বসে আছ? এভাবে অনিয়ম করলে সত্যি তোমার শরীর খারাপ হবে রাণী। যাও, শীগ্‌গির খেয়ে এসো। অনেক রাত হ'লো যে!"

"কেন—তুমি খাবে না?"

"আমি খেয়ে এসেছি।"

"খেয়ে এসেছ?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় খেলে? তোমার তো কোথাও খাওয়ার কথা ছিলনা!"

"কথা না থাকলে কি খেতে নেই?"

খুশী হ'তে পারলো না রাণী এই ধরণের জবাবে। তার এই অ-খুসির ভাব লক্ষ্য করে একটু মৃদু হাসল আশীষ। তার সামনে এগিয়ে এসে তার মুখখানা ধরে বললে, "রাগ করোনা লক্ষ্মীটি, আজ আমাদের রিহার্স্যালে সন্তুষ্ট হ'য়ে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ম্যানেজার যা খাইয়েছেন!"

"তাই বুঝি?" কেটে যায় রাণীর গুমোট। "কিন্তু, তোমার এত দেরী আমার মোটেই ভাল লাগে না। আচ্ছা, ম্যানেজার না হয় খাইয়েছেন, এদিকে বাড়ীতে যে আমার অবস্থা কি, একটুও কি মনে হয়নি তোমার।" অভিমানের সুরেই বলে গেল রাণী।

আশীষ রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেও সামলে নিল অভিনেতা-সুলভ প্রেম নিবেদনের ভঙ্গীতে। রাণীকে নিজের বাঁ হাতে বেষ্টন করে ধরে ডান হাতে মুখখানা ধীরে ধীরে তুলে ধরে স্পষ্ট করে চেয়ে বললো, "সত্যি রাণী, খুবই ব্যস্ত হচ্ছিল মনটা। কিন্তু—" চাপা অভিমান এবারে আর চাপা রইলো না।। জোর ক'রে ছাড়িয়ে নিলো রাণী নিজেকে আশীষের বাহুপাশ থেকে।

বিবাহিত জীবনে এই প্রথম দেখছে সে আশীষের এই ঔদাসীন্য। যে আশীষ তাকে পথের মেয়ে নয়—পথের মাণিক বলে বুকে তুলে নিয়েছিল স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে,—তার কাছ থেকে কোনো রকমের ঔদাসীন্য সে কি ক'রে সহ্য করবে? অথচ জীবনটা রাণীর চিরকালই বিড়ম্বনায় ভরা। সর্বদাই ভয়, কি জানি কি হয়। আশীষের আজকালকার এই উপেক্ষা অনেক দিন থেকেই তাকে ব্যথিত করছে, কিন্তু তবু রাণী তার মনের ভাবটা প্রকাশ করতে সাহস পায় না। তাই আজ যখন আশীষ আদর ক'রে বোঝাতে গেল তাকে, অমনি অনেক দিনের পুঞ্জীভূত অভিমান ঠেলে উঠ্‌লো তার বুকের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যথিত হৃদয় থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। আশীষের চোখে তা এড়ালোনা। লক্ষ্য করলে সে রাণীর ভাবান্তর। "একি! এরমধ্যে এমন দীর্ঘনিঃশ্বাস? কেন রাণী কী হ'লো তোমার," বলেই আশীষ ব্যস্ত হয়ে রাণীর মুখোমুখি গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

নিজেকে কোন রকমে সামলে নেয় রাণী। ধীরে ধীরে আশীষের একখানা হাত টেনে নিজের হাতের মুঠোয় ধরে আবদারের সুরে বললে, "দেখ, একটা কথা বলবো?"

"কি কথা?" বলে আশীষ পুণরায় রাণীর মুখপানে তাকালো।

একটু ইতস্ততঃ করে কি যেন ভাবতে থাকে রাণী।

"কী হ'লো, চুপ করে রইলে যে?"

প্রত্যুত্তরে বলে উঠলো রাণী, "তুমি এ কাজ ছেড়ে দাও।"

রাণীর কথায় একেবারে স্তম্ভিত হ'লো আশীষ।

"কাজ ছেড়ে দেবো? কেন? আচ্ছা রাণী বলো তো দেখি তোমার কি হয়েছে?"

"কিছু হয়নি।" মাথা ঝোঁকে বলল রাণী।

"উঁহু, ঠিক জবাব হ'লো না। তুমি যেন কী একটা কথা আমার কাছে গোপন করছো। পাগলের মত এসব কী বলছো—চাকরী ছেড়ে দিতে?"

রাণীর কোন সাড়া না পেয়ে পুণরায় একটু থেমে বলল আশীষ, "কেন চাকরী ছাড়তে বলছো?"

"এ কাজে যে তোমার ভীষণ খাটুনী। তা ছাড়া—" মুখের কথা কেড়ে নেয় আশীষ, "তা ছাড়া কী?"

উত্তর করলে রাণী তার সুন্দর মুখখানা আশীষের মুখের ওপর নেড়ে—"ভাল লাগেনা আমার এতক্ষণ তোমায় ছেড়ে থাকতে—"

"ইস্, কৈ দেখি মুখখানা একবার! এতদিন তো মুখে কথা ফোটেনি?"

আদর করে চেপে ধরলো আশীষ রাণীর মুখখানা তার বুকের মধ্যে। সেই অবস্থায় থেকেই রাণী বললো, "তা ছাড়া, এতরাত ক'রে আসা, কি জানি রাস্তায় কোন বিপদআপদ হয়, আমি তোমার জন্য কত ভাববো বলতো? আমাকে ভাবিয়ে—তুমি আর কিছুতে মেতে থাকো, এ যে আমি ভাবতে পারি না।"

কিছুক্ষণ চুপকরে থেকে কোমল কণ্ঠে বলে উঠলো আশীষ, "রাণু, যমডোবার কথা তোমার মনে পড়ে?"

মাথা নীচু করে বসেছিল রাণী আশীষের পাশে। মুখ দিয়ে তার ছোট্ট একটি সুমিষ্ট স্বর বের হলো, "পড়ে।"

"সেদিন জ্যোৎস্না রাতে তোমাতে আমাতে যে কথা হয়েছিল, সে কথা কি ভুলে গেলে?"

"না ভুলিনি। সে কথা তো ভুলবার নয় যে ভুলবো। সেদিনের পরিচয়েই তো আমি তোমাকে পেয়েছি।"

চাঁপার কলির মতো রাণীর আঙ্গুলগুলির উপর হাত বুলাতে বুলাতে বললে, "তা হলে সে সব কথা মনে আছে—ভোলোনি নিশ্চয় ?"

"না, আমি কিছু ভুলিনি। সব মনে আছে আমার।"

"তা হলে সেদিনের মত আজও বলছি তোমার মত লক্ষ্মী প্রতিমা যার ঘরে—তার স্বামীর কি কখনও আর কিছুতে মেতে থাকা সম্ভব ? এ শুধু টাকার জন্যে তোমায় ছেড়ে থাকা।"

অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে রাণী। খানিক চুপ করে থেকে বললে, "আমায় ক্ষমা করো। একথা আমি আর বলবো না।" বলতেই আকস্মিক ভাবে অপরাধীর মতো তার চোখ দুটি দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল দুগাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। টেনে নিলে আশীষ তাকে তার কাছটিতে।

সযত্নে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে, আদরে আদরে তাকে অস্থির করে দিলে সে। এমনি সময় দেওয়াল ঘড়িটায় ঢং ঢং করে তিনটে বাজার সংকেতে চমকে উঠল আশীষ ব্যস্ত হয়ে রাণীকে বললে "যাও, আর কোনো কথা নয়। অনেক রাত হয়েছে কিন্তু, চট্ করে খেয়ে এসো। আমি যাই খোকনের কাছে অনেকক্ষণ তাকে দেখিনি।"

আশীষের কথায় রাণীর মনের সকল দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়। মেঘমুক্ত আকাশের মতো হালকা হয় তার মন। মনের বীণায় আবার সে ফিরে পায় আগেকার সেই মধুর ঝংকার।

মাস খানেক পরে একদিন রাণী খোকনকে কোলে নিয়ে বাইরের বারান্দায় পায়চারী করছিল। আশীষের ফেরবার কথা ছিল দুপুরে। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল এলো। তবুও আশীষের পাত্তা নেই। রাণী খোকনকে কোলে নিয়ে পায়চারী করতে করতে ভাবে,—কেন যে আশীষের ফেরবার সময় ঠিক থাকেনা তা আজও বুঝতে পারেনা সে। জিজ্ঞাসা করলেই সেই পুরোনো কথা—নানান ঝামেলা, টাকার গরজ ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর অনুযোগ করলে বলবে, এ তো আর অফিসের কাজ নয় যে টাইম মতো আসতে হবে। হয় তো তাই। কিন্তু তবুও কোথায় যেন রাণীর মনে একটু 'কিন্তু' থেকে যায়। তার—মনে হয় বোধহয় আশীষের আগের মতো তার আর খোকনের উপর তেমন টান নেই। কেমন যেন ছাড়া ছাড়া ভাব। আজকাল আশীষ যেন কেমন হয়ে গেছে। আগের মতো মন খুলে তেমন কথাও বলেনা। বড়ো যেন গম্ভীর হয়ে গেছে সে। বিচলিত হয়ে পড়ে রাণী। পরক্ষণেই সমস্ত ভাবনা চিন্তা ঠেলে ফেলে নিজের মনকে আবার সান্ত্বনা দেয়। না, না কখনও তা হ'তে পারেনা। এ হয়ত তার মনের দুর্বলতা মনের ভ্রান্তি মাত্র।

এমন সময় চাকর নিধুরাম এসে বললে, "মা, ধুপী এসেছে।"

"কে—নিধে?" মনটা রাণী জোর করে হালকাকরবার চেষ্টা করে।

"হাঁ মা।"

"হ্যাঁ রে নিধে, বাবু কখন আসবেন বলে গেছেন কিছু?"

"কেন মা, আপনি শোনেননি, বাবু তো আপনাকে যাবার সময় বলে গেলেন দুপুরে আসবেন।"

কেমন যেন সে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে প্রশ্নটা করে। কথাটা ঢাকবার জন্যে বলে উঠল রাণী, "বলেছিলেন হয়তো। আমি শুনতে পাইনি। তা যাক্ তুই নে ওকে। আমি হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছি কাপড়গুলো।"

খোকন নিধেকে দেখে আনন্দে দুহাত বাড়িয়ে দিলে যাবার জন্যে। মুখে তার আধো আধো বোল—তা সাধারণে কিছু না বুঝলেও নিধুর কাছে কিন্তু ঘোরতর অর্থপূর্ণ এবং সবগুলির সারমর্ম হলো—দুনিয়ায় খোকন সব চেয়ে চিনেছে শ্রীনিধিরাম গুণনিধিকে। খোকনকে কোলে নিতে নিতে সে বললে, "মা খোকনটা আমায় কেমন চিনেছে দেখেছেন ?"

"তোকে আর চিনবে না কেন নিধে ! তুই ওকে যা তৈরী করেছিস। দামাল ছেলে একদণ্ডও যে ঘরে থাকতে চায় না—এখন সামাল দে। দেখিস ওর জ্বর রয়েছে, ঠাণ্ডা যেন না লাগে। এ চাদর খানা গায়ে জড়িয়ে নে," বলে রাণী খোকনকে নিধের কোলে দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। ধোপার কাপড়গুলো মিলিয়ে নিয়ে, আলনা থেকে ময়লা জামা কাপড় জড়ো করল ঘরের মেজেতে। হঠাৎ আশীষের একটা চাপকানের পকেটে কি যেন খচখচ করে হাতে বাজলো। আওয়াজ থেকেই কেমন যেন রাণীর ধারণা হ'লো নতুন একটা দশটাকার নোটই হবে। তাই পকেটে যখন হাত গলাচ্ছে তখন মুখে তার একটা কৌতুক পূর্ণ চাপা হাসি। কিন্তু—একি ? শক্ত একটা সাদা কাগজ ! চিঠির কাগজই তো ! খুলে পড়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল রাণী। সঙ্গে সঙ্গে চাপকানটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল মাটিতে। কোন ধুতিগুলো তার ধোপা বাড়ী দেবার প্রয়োজন আর কোনগুলো যে প্রয়োজন নেই, সে সমস্তই যেন তার চোখের সামনে গুলিয়ে গেল। চরকী বাজীর মতো

মাথাটা ঘুরে গিয়ে অন্ধকার দেখতে লাগল চোখে। তার চোখের সামনে যেন সমস্ত বাড়ীটা দুলতে থাকে ভূমিকম্পের মতো। সেইখানেই বসে পড়ে সে ধপ্ করে। সামনের টেবিলের দুটো পায়া হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে। একি! এ কী জানলে সে আজ। একি সম্ভব! তবে কি—" দু'হাতে বুক চেপে ধরে রাণী। কে যেন তারে বুকের ভেতরে হাতুড়ি দিয়ে ভেতরের হাড় সব ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। না, না, না, তা কখনও হ'তে পারেনা, কখনও হতে পারে না। সে কিছুতেই তার স্বামীকে পারবেনা এমন ডাকিনীর হাতে ছেড়ে দিতে। যেমন করেই হোক্, সে এপথ থেকে তার স্বামীকে ফিরিয়ে আনবেই আনবে। আজ আশীষ ফিরে এলে সে তার পায়ে মাথা খুঁড়বে। কাকুতি মিনতি করে বলবে একাজ ছেড়ে দিতে। সে কি তার কথা রাখবেনা? রাখবে—নিশ্চয় রাখবে। কখনও পারবেনা সে তার কথা ফেলতে। এই মানুষটিই যে তাকে একদিন ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিল। সেই মানুষটিই কিনা আবার তাকে বিপদের পথে—

"মা।"

মা ডাকে চৈতন্য ফিরে আসে রাণীর।

"ধূপী যে বসে আছে মা।"

"ওকে আজ যেতে বল নিধে।"

"সে কি মা! আপনি যে কাপড় দেবেন বললেন?"

"বলেছি বলেই কি দিতে হবে?" বেশ একটু তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিল রাণী।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায় নিধে। এখানে কাজে লাগার পর থেকে কোনদিন রাণীর এমন রাগ দেখেনি সে। হঠাৎ কি যে হ'লো

যায়, বুঝতে পারেনা সে। থতমত খেয়ে :যায় রাণীর কথায়। আমতা আমতা করে বললে, "তাহলে কবে আসবে মা ?"

"বলছি চলে যেতে!" রুক্ষতা আরও স্পস্ট হলো রাণীর কণ্ঠস্বরে।

নিধে চলে গেলে অনেকক্ষণ তেমনি ভাবে বসে আকাশ-পাতাল অনেক কিছুই ভাবতে থাকে রাণী। তারপর কি যেন মনে করে শিথিল হস্তে চিঠিখানা রেখে দিলে চাপকানের পকেটে। মনে মনে স্থির করলে, সে যে এত খবর জানতে পেরেছে তা বুঝতে দেবেনা আশীষকে—কিছুতেই না।

"রাণী, কী করছিস বসে বসে ?"

চারুদির ডাকে ঘাড় ঘুরিয়ে রাণী পেছন ফিরে তাকায়।

"কে চারুদি।"

"হাঁ। কি ভাবছিস বসে বসে বলতো রাণী। কখন থেকে তোকে ডাকাডাকি করছি তোর যে হুঁস্ই নেই। কি করছিস ?"

নিজেকে জোর করে সামলে নেয় রাণী। জামা কাপড়গুলো একধারে কোন রকমে জোর করে সরিয়ে রাখতে রাখতে বেশ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে বললে, "দেখতেই তো পাচ্ছ। এগুলো ধোপা বাড়ী দেব বলে টুকে নিচ্ছিলাম।"

তোকে একটা কথা বলতে এসেছি রাণী। আমাদের পাড়ায় রাম-বাবুদের বাড়ীতে আজ সন্ধ্যেবেলায় মায়ের নামে কীর্তন হবে। অনেক জায়গা থেকে নাম করা গায়ক গায়িকারা নাকি আসবে কীর্তন গাইতে। রামবাবুর মেয়ে আমাকে আর তোকে বার বার করে যেতে বলে গেছে। আমি যাবো। তুই যাবি আমার সঙ্গে ?"

চারুদির কথায় চুপ করে থাকে রাণী। কি বলবে সে। এখন কি তার কীর্তন শুনবার সময়!

"কিরে, চুপ করে কি ভাবছিস ? যাবিনে ?"

হায়রে ভগবান,—কি যে ভাবছে সে তা কি করে বোঝাবে চারু-দিকে!

"চুপ করে রইলি যে? তোর ইচ্ছে নেই?" চারুদি আবার জিজ্ঞাসা করল।

এতক্ষণে যেন উত্তর দেবার সময় পেল রাণী বললে, "না—ওঁর অনুমতি না পেলে যেতে পারবো না।" বেশ কঠিন স্বরে বললে রাণী।

হায়রে মানুষের মন—এযে কি! কখন যে কি ভাবে কি রূপে দেখা দেয়, তার কোনই ঠিক ঠিকানা নেই। মনে হয় জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই ভাবনার উৎপত্তি ও প্রকাশ। কখনও মধুময় আবার কখনও বা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। মন সুস্থ থাকলে যা কিছু সুন্দর, পবিত্র ও প্রিয় তা সমস্তই মনকে আনন্দ দেবে। কিন্তু মন যদি সুস্থ না থাকে তা হ'লে কিছুই ভাল লাগবে না।

রাণীর দশাও ঠিক তাই হয়েছিল। আশীষের জামার পকেট থেকে চিঠিখানা পড়ে অবধি, তার মন মেজাজ কিছুই ঠিক ছিলনা। সব সময় একটা দারুণ অস্বস্তি অনুভব করছিল সে। এক অব্যক্ত বিরক্তি ও বিতৃষ্ণায় তার সমস্ত মন প্রাণ ভরে উঠল। অতীতে কতবার, কত জায়গায় তো এই চারুদির সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছে। কিন্তু কই, তখন তো আশীষের অনুমতি নেবার কোনো অজুহাত দেখায়নি সে চারুদিকে। প্রাণখুলে সরল মনে চারুদি যেমন রাণীর কাছে তাদের ঘর সংসারের সমস্ত খুটিনাটির কথা খুলে বলতো, তেমনি রাণীও বিদেশে এসে, ভগ্নীস্থানীয়া চারুদিকে পেয়ে ভাব জমিয়ে আপন করে নিতে পেরে, সত্যি যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচে গিয়েছিল।

যে চারুদি রাণী বলতে অজ্ঞান, যে চারুদি রাণীকে ছোট বোনের

মতো দেখতো, রাণীর আপদে বিপদে প্রাণপণে সাহায্য করত, আজ সেই চারুদির সঙ্গে গান শুনতে যাওয়ার কোন প্রেরণাই সে খুঁজে পেলো না।

চারুদি বুদ্ধিমতী রমণী। আশীষের সঙ্গে রাণীর কোনো বিষয়ে মনোমালিন্য হ'য়ে থাকবে মনে করে, সেটা হালকা করবার জন্যে একটু মৃদু হেসে ঠাট্টার ছলে বললে, "আজ বুঝি আশীষবাবু মৌজ ঠিক রাখতে পারেননি?"

চারুদিকে ভুল বুঝলো রাণী। তার অসমাপ্ত কথার মাঝে উত্তেজিত হ'য়ে জবাব দিলে, "উনি যাই করুন না কেন চারুদি, আমার সামনে ওর নিন্দে কখনও কোরো না। এ আমি সত্যি পছন্দ করিনে।" বলেই আষাঢ়ের মেঘের মত মুখখানি ভার করে, কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই ঝড়ের মতো বারান্দা পার হ'য়ে বাইরের ঘরে ঢুকে পড়ল।

রাণীর এরকম অপ্রত্যাশিত জবাবে ও অদ্ভুত ব্যবহারে একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল চারুদি। নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, সিঁড়ি বেয়ে, ক্ষুণ্ণমনে ধীরে ধীরে নীচে নেমে ফিরে এলো তার ঘরে।

রাণী ঘরে ঢুকেই দেখল আশীষকে। আশীষকে দেখে তার রাগ আরও দ্বিগুণ হ'য়ে বেড়ে যায়। জোর করে নিজেকে সামলে নেয় তার নিজের কাছে নিজের প্রতিশ্রুতির কথা মনে করে।

"কখন এলে?"

ধবধবে জামাটা গা থেকে খুলতে খুলতে বললে, "এই তো এখন।"

"তোমার না দুপুরে ফেরবার কথা ছিল।"

"ফিরতে পারলুম কই।"

"কেন?"

উষ্মা প্রকাশ করে উত্তর করলে আশীষ, "সে কৈফিয়ৎ আমি রোজ রোজ তোমায় দিতে পারবোনা।"

হতভম্ব হ'য়ে খানিক তাকিয়ে থাকে রাণী আশীষের দিকে। তারপর ক্ষুব্ধচিত্তে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, "বেশ আর শুধাবোনা।" মনের ব্যথা মনে চেপে ভাবতে থাকে রাণী, এই কী সেই আশীষ ? যে আশীষ দৈবাৎ কিছু সময়ের জন্যে কোন কাজে বাইরে গেলে ফিরে এসে তাকে সামনে বসিয়ে কত রকমের হাসি ঠাট্টার প্রশ্ন করে করে হয়রান করে তুলতো। যেন কত দিন, কত মাস, কত যুগ পর, আশীষের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার। অনর্গল বকে যেত সে নিজের মনেই। একটা কথা বলবার ফুরসুৎ পর্যন্ত দিতোনা এই মানুষটি তাকে। এর জন্যে কত অভিমানই না করেছে সে। সে অভিমান কত রকমের দুষ্টুমী করেই না ভেঙ্গে দিতো এই মানুষটি, সেই মানুষের আজ এমন পরিবর্তন ? সামান্য একটি প্রশ্নতে ?

দুর্দান্ত অভিমানে ঘর থেকে বেরুতে যায় রাণী। তার চলার দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে বললে আশীষ, "চা হ'য়েছে ? আনো শীগগীর— আবার এক্ষুনি বের হ'তে হ'বে যে।"

মুখ শুকিয়ে যায় রাণীর আশীষের কথায়। চলার পথে থম্‌কে দাঁড়ায় সে। শুষ্কমুখে বললে, "এখন আবার বের হবে ? সবে বাসায় ফিরলে খেয়ে একটু বিশ্রাম করবে না ?"

"বিশ্রাম করবার সময় কই যে বিশ্রাম করবো ?"

অভিমানে ও দুঃখে মনে মনে ফুলতে থাকে রাণী। মনের ব্যথা সে কাকে জানাবে, কাকে বলবে। বুক যে তার ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে। তবুও বাধ্য হ'য়ে বললে "এখন না গেলেই কি নয় ?"

"কেন বাধা দিচ্ছ ?"

"খোকনের আজ চারদিন জ্বর। একবার তো খোঁজটাও নাওনা।"

আলমারী থেকে একটা পাট-করা সার্ট বের করে বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল,"তার জন্যে ভেবোনা। আমি টাকা দিয়ে যাচ্ছি। তুমি নিধেকে একবার ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিও। এক মুহূর্তও সময় নেই আমার।"

আশীষের ব্যবহারে উদগত অশ্রু গোপন করতে করতে ভারী গলায় বলে উঠল রাণী, "ঘরের ছেলে বৌ মরে গেলেও কোনদিন বোধহয় তোমার সময় হবেনা খোঁজ নেবার।"

"কেন মিথ্যে রাগ করছো—বলছি খুব জরুরী কাজ।" বলেই আশীষ একটা ঢোক গিললো। বোধহয় মিথ্যে কথাটাকে ঢাকবার জন্যে।

তার এই নির্লজ্জ মিথ্যে উক্তিতে বারুদের মত সর্ব শরীর জ্বলে উঠল রাণীর। তবুও নিজেকে সংযত করে বললে সে "কাজ জরুরী হতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে কি খোকনকে দেখবার একটুও সময় হবেনা?" রাণীর অনুযোগে একটু যেন হকচকিয়ে যায় আশীষ। সে দুচার মিনিট। তারপর বেশ বিরক্ত হয়ে বললে, "সত্যি রাণী, তোমার এই ঘ্যান্-ঘ্যানানি প্যান্-প্যানানি ভাল লাগেনা আমার। যাবার সময় ওকে দেখে গেলেই তো হ'লো।"

বেহায়া মেয়ের মত তবু রাণী জিদ করে,"আজ তোমার না গেলেই কি নয়?"

"কেন, হয়েছে কি?" চটে গিয়ে আশীষ রাণীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ায়।

"আজ সপ্তাহ খানেক হ'লো বৌদির চিঠি এসেছে যে।"

"কী লিখেছেন?" বলেই, পাট করা সার্টটি খুলে গায় দিতে লাগল।

সেদিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে বললে,"তোমার জন্যে দাদা চাকরি ঠিক করেছেন—আনবো চিঠি খানা ?"

"না। দরকার নেই। পরে দেখলেই চলবে।"

"কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেল যে।"

"তা হোক," বলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে পরিপাটি করে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আবার বললে, "কেন—এখানে কি চাকরি করছিনে ?"

"তা তো করছো জানি। কিন্তু দাদা বৌদির যে বরাবরই ইচ্ছে আমরা হুগলীতেই থাকি। তাই বলছিলাম কী তাঁদের কথা না রাখলে তাঁরা যে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন।"

"তা হোক—আমি এ কাজ ফেলে কোথাও কাজ নিতে পারবোনা।" হতাশ হ'য়ে আশীষের দিকে ফ্যালফ্যালিয়ে তাকিয়ে থাকে রাণী। তারপর আচমকা আশীষের সামনে এগিয়ে এসে তার একখানা হাত চেপে ধরে মিনতির কণ্ঠে বলে উঠল, "তুমি অমত করোনা—দাদা বৌদিদের বিরুদ্ধে চলা কি ভাল হ'বে ?"

জোর করে রাণীর হাত সরিয়ে দেয় আশীষ।, "বার বার তুমি আমায় এমন অনুরোধ করোনা। একাজ ছেড়ে আমি কিছুতেই কোথাও যেতে পারবো না।" ঘৃণায় আশীষের কাছ থেকে দূরে সরে এল রাণী। পুণরায় নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললে, "তোমার অমত করা কি ভালো হবে ? একদিন যে দাদা বৌদি তোমায় লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন, আমাকেও অসময়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন এমন হিতাকাংক্ষী দাদা বৌদির মনে ব্যথা দেওয়া কি উচিত হবে ?' পকেট থেকে রুমালটা বের করে, সজোরে মুখ মুছতে মুছতে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিলে, "হুঁ, কবে কে আমায় কি করেছিলেন না করেছিলেন তা মনে করে, তাঁদের কথা রাখতে গিয়ে, এমন কাজটি ছেড়ে কিনা

হুগলীর মত 'ন্যাস্টি' জায়গায় গিয়ে পড়ে থাকতে হ'বে ? না, সে আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এতে ওঁরা যা মনে করেন করবেন।"

রাণী একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল আশীষের জবাব শুনে। মানুষ মানুষের নিমক খেয়ে এত সহজে কেমন করে তা ভুলতে পারে, রাণীর কাছে আশীষ যেন তারই একটি জ্বলন্ত প্রমান। এ ভাবে কথা বলে কাজ হাসিল হবেনা বুঝতে পেরে প্রসঙ্গটা অন্য ভাবে পাড়ল রাণী—"কিন্তু তোমার দিকটা তো দেখতে হবে। এতে যে তোমার ভীষণ পরিশ্রম।

"পরিশ্রমের চাইতে আমার বাসায় সময় মতো না ফেরবার কারণটাই যেন তোমাকে বেশী করে সন্দিগ্ধ করে তুলেছে, নয় কি ?" বলেই সক্রোধে তাকালো আশীষ রাণীর দিকে।

ধৈর্য্যের বাঁধ হারিয়ে ফেললো রাণী, আশীষের এমন নিলর্জ্জ উক্তিতে। মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজের কাছে নিজের প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়ে উত্তেজিত হ'য়ে বলে উঠল সে—"সন্দেহ করা কি অন্যায় ?"

"কি বললে ?" টগ্‌বগ্‌ করে উঠে আশীষের শরীরের রক্ত।

যা সত্যি তাই বললাম। কাজের অছিলায় রোজ আমায় প্রতারণা করে বাসা থেকে বেরিয়ে যাও তুমি !"

আয়নার সামনে বসে চেহারাটা নানা ভঙ্গিতে দেখছিল আশীষ। রাণীর এ আবিষ্কারে মুখ দেখা ভুলে গিয়ে কটমটিয়ে তাকাল তার দিকে।

"কি বললে ? তোমায় আমি—"

আশীষের মুখের কথা কেড়ে নেয় রাণী, বিদ্রোহিনী হ'য়ে বললে "হ্যাঁ।"

রুখে দাঁড়ায় আশীষ। "প্রমাণ দেখাতে পার ?"

"প্র—মাণ ?" ব্যঙ্গ করে বলে উঠল রাণী।

"হ্যাঁ, দেখতে চাই প্রমাণ।" টেবিল চাপড়ে গর্জে ওঠে সে।

"দেখাবো ?" বলেই ক্ষিপ্রপদে মুহূর্তের মধ্যে চিঠিখানা এনে ছুঁড়ে দিলে তার মুখ বরাবর।

ক্ষণিকের জন্যে নির্বাক হ'য়ে থাকে আশীষ। শুধু নির্বাক নয়, পাথরের মত যেন অচল হয়ে পড়ে। সে ভাবটা কেটে গেলে, একটা তীব্র দৃষ্টিতে রাণীর দিকে তাকিয়ে বলে, "এ তুমি পেলে কোথায় ?"

"যেখানেই পেয়ে থাকি—এ প্রশ্ন করতে লজ্জা করছেনা তোমার ?"

রাণীর জবাবে আগুন হয়ে উঠল আশীষ। চিৎকার করে বলে উঠল, "কোন অধিকারে আমাকে না জানিয়ে আমার জিনিষে হাত দিয়েছো তুমি ?"

"আমার অধিকার আছে বলেই।" উত্তপ্ত কণ্ঠে উত্তর করলে রাণী।

"অ-ধি-কা-র—" ভ্রূকুটি করে বলে উঠল আশীষ। "ন্যাকামী করবার আর জায়গা পেলেনা! যে ছিল পথের মেয়ে, তার আবার অত্ত কিসের ?"

সন্ত আহত উন্মত্ত ব্যাঘ্রীর মতো ক্ষিপ্তা হয়ে উঠল রাণী আশীষের শেষ কথাটিতে—

"হ'তে পারি আমি পথের মেয়ে, কিন্তু তাই বলে তোমার মতো শিক্ষিত ভদ্রঘরের সন্তান হয়ে, মিথ্যার জাল বুনতে, প্রবঞ্চনা করতে শিখিনি আমি।"

"কি! কি বললে—আমি মিথ্যাবাদী, আমি প্রবঞ্চক ?"

"সমস্ত সত্য গোপন করে, অসত্যকে সত্য বলে চালিয়ে দিতে, যার বিবেকে এতদিন এতটুকু বাধেনি, তাকে এছাড়া আর কি বলে, বলতে পার ? শুধু কি তাই—সঙ্গে সঙ্গে আর একটি মেয়েরও সর্বনাশ—"

রাণীর কঠোর কথায় দ্বিগুণভাবে জ্বলে উঠল আশীষ। তীব্র কটাক্ষে রাণীর দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠল সে—"মুখ সামলে কথা বলো—

নয়তো সামনে থেকে দূর হয়ে যাও, পথের মেয়ে কোথাকার!" বলেই তড়িৎ গতিতে সামনের টেবিলের উপর থেকে, ভারী পেতলের ফুলদানিটা হাতের মুঠোয় তুলে, সজোরে ছুড়ে মারলো রাণীকে লক্ষ্য করে।

"মাগো—" বলে আর্তনাদ করে বাঁ হাতখানা সজোরে চেপে ধরে বসে পড়ল রাণী সেইখানে। "উঃ, আমায় মারলে!" চাপা কণ্ঠে ভৎর্সনা করে উঠল রাণী। "তোমার এত অধঃপতন হয়েছে! ভগবান, আর কত দুঃখ দেবে আমায়!" বলেই উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠল সে। সেই অবস্থায় উঠে দাঁড়ায় রাণী। জলভরা চোখ দুটি তুলে তাকায় একবার আশীষের দিকে, যেমন একদিন অসহায় ভাবে তাকিয়েছিল বিন্দিঠাকুরাণীর মুখের দিকে, যমডোবায় যাবার আগে।

কাতরকণ্ঠে বলে উঠল রাণী, "যাবো,—পথের মেয়ে পথেই যাবো যখন আমায় দূর হয়ে যেতে বলেছ তখন আর এক মুহূর্তও থাকবো না এখানে। কিন্তু যাবার আগে একটি কথা,—আমায় ভুল বুঝনা। আজ যে মোহে পড়ে বিনা দোষে বাড়ী থেকে আমায় তাড়ালে, সে ভুল বোঝবার শক্তি যেন একদিন ভগবান তোমায় দেন।" বলেই সে মুহূর্তের মধ্যে ক্ষিপ্রার মত রুগ্ন খোকনকে শয্যা থেকে জোর করে বুকে তুলে নিল।

"দিদি!" আচমকা পেছন থেকে ডাকলো চামেলী। যাকে নিয়ে এদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি।

"একি! তুমি এখানে?" বলেই হতভম্ব হ'য়ে চেয়ে থাকে আশীষ চামেলীর দিকে। গম্ভীর ভাবে উত্তর করলে চামেলী, "কেন বিশ্বাস হচ্ছেনা বুঝি?"

চামেলীর স্বরে শ্লেষের ঝাঁজ পেয়ে হিমসিম খেয়ে যায় আশীষ।

আমতা আমতা করে বললে, "না, না, তা হবেনা কেন! মানে, বলছিলাম কি, তুমি এখানে আবার এলে কেন? আমিই তো এখনি যাচ্ছিলাম।"

"বোধহয় খুব অন্যায় করে ফেলেছি, না? ভেবেছিলে, কোনদিনই যখন আমার পক্ষে তোমার বাড়ী পর্যন্ত আসা সম্ভব নয়, তখন তোমার ভণ্ডামি কোনো দিনই আর ধরা পড়বে না; কেমন, তাই না? কিন্তু জেনে রাখো, আশীষবাবু, এ জগতে মেয়েরা যত কঠিন কাজ করতে পারে, পুরুষে তা পারে না। আরও একটা কথা, মনের অলিতে-গলিতে আলো ধরে ধরে ঘুরে বেড়াবার যে ক্ষমতা মেয়েদের আছে, পুরুষের তার অর্ধেকও যদি থাকতো, তবে বোধহয় জগৎটা অনেক কলঙ্কের হাত থেকে রেহাই পেতো।"

"কিন্তু—— "

"থাক সে কথা। তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না। এখন জানবার চেষ্টাও করো না। এখনকার মতো খালি এইটুকুই বলে রাখি, এই যে বুদ্ধির দোষে দুটি মেয়ের সর্বনাশ করলে, এর ফল তোমার কিছু গুরুতর ক'রেই পেতে হবে।"

কথাগুলো বলেই চামেলী রাণীর কাছে এগিয়ে গেলো। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো তার মুখের দিকে নীরবে। রাণী যেন সে দৃষ্টির কিছুটা অর্থ বুঝলো, সবটা না বুঝলেও। এর মুখের এতক্ষণের কথাগুলোতে রাণীর এই ধারনা জন্মালো, যে আর যাই হোক, মেয়েটা নিতান্তই একটা বাজারে মেয়ে নয়। এবং আশীষ নিশ্চয়ই কোথাও একটা খুব বড় রকমের গোলমাল ক'রে ফেলেছে যার জন্য এই মেয়েটির আজ এই ধরণের আবির্ভাব। রাণীর হাত দু'খানি ধরে চামেলী ডাকলো "দিদি!"

রাণী দেখলো, চামেলীর চোখের কোণে জল; বড় সুন্দর সত্যি তার

চোখ দুটো। আর শ্রীও তার একটা আছে, যাকে মেয়েরা বলে লক্ষ্মীশ্রী। কিন্তু সে শ্রী তো তারও ছিলো, তবে তার কপাল কেন ভাঙলো এমন করে? যাই হোক একটা সমবেদনার উচ্ছ্বাস এসে রাণীর অন্তরের দাবানলকে সাময়িকভাবে স্তিমিত করে দিলো।

চামেলী দেখলো রাণীর বাঁ হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে ঝর্ ঝর্ করে। "ইস!" বলেই চামেলী একবার চেয়ে নিলো আশীষের দিকে। অতি ভয়ঙ্কর সে চাহনি! তার পর টেনে নিয়ে গেল রাণীকে পাশের ঘরে। পরিষ্কার ন্যাকড়া আর তুলো য়করে আইডিন দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিলো সেই ক্ষতস্থান।

রাণীর মনের মধ্যে জেগে উঠ্‌লো অসংখ্য জিজ্ঞাসা, কিন্তু এইমাত্র যে ঝড় উঠেছে তার হৃদয়াকাশে, তার গর্জন যেন কেবলই তাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে, এই ঘর থেকে আর যে কোন জায়গায়—পৃথিবীর আর যে কোন নিভৃত কোণে,—খালি আশীষের থেকে,—বহু, বহু, দূরে। রাত তখনও শেষ হতে অনেকটা বাকী আছে। চামেলীকে রাণীই যেতে দেয়নি সেদিন। দু'জনে শুয়েছিলো একই জায়গায়,—পাশের ঘরে আশীষ—হাজতের আসামীর মতো। ওরা তখন বেশ ঘুমুচ্ছে। রাণী উঠে পড়লো। জেগেই ছিলো সে সারারাত। অনেক ভেবে শেষে এই ঠিক করলো সে, তারই স'রে পড়া উচিত এদের মাঝখান থেকে। অন্ততঃ আশীষের বর্তমান মনের অবস্থায় দু'য়ের মধ্যে চামেলীই তার অধিকতর কাম্য। সুতরাং তার তুষ্টিতেই রাণীর নিজের তুষ্টি হওয়া উচিত। সূর্যমুখীও তো তাই করেছিলো, নগেন্দ্রনাথকে কুন্দের হাতে স'পে দিয়ে চলে গিয়েছিলো নিরুদ্দেশের পথে। সেও তাই ক'রবে। কিন্তু, খোকন? খোকনকে সে ছাড়তে পারবে না। বুকে করে তুলে নিল ঘুমন্ত খোকনকে। আশীষের ঘরে ঢুকে আশীষকে দেখে নিলো ঘরের স্তিমিত আলোকে অনেকক্ষণ ধরে।

বুকের মধ্যে কান্নার কল্লোল্ শুনতে পেলেও রাণী জোর ক'রে বাঁধ দিয়ে রাখলো তাকে, কারণ এ সময়ে কঠিন না হ'লে সংকল্প ভেসে যাবে। তার পর ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়লো সে একেবারে নির্জন পথে।

এগারো

জানালা দিয়ে রদ্দুর এসে চামেলীর চোখে লাগাতে, সে চোখ মেলেই বড় লজ্জিত হ'য়ে পড়লো। নতুন জায়গায় এসে, এত ঘুম যেন সে কখনও ঘুমোয়নি। আর বেশি লজ্জিত হ'লো এই ভেবে যে, তার নব-পরিচিত 'দিদি'—যাকে সে একনজরেই লক্ষ্মী-প্রতিমা বলে চিনেছে—নিশ্চয়ই এতক্ষণ গৃহকর্মে নিযুক্ত হয়েছে। আর, না জানি, আশীষ দিনের আলোতে এতক্ষণে কি ভাবে তাকে সামলে নিয়েছে। কুণ্ঠায় ও কৌতূহলে জড়সড় হয়ে, চামেলী আস্তে আস্তে এসে আশীষের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলো, আশীষ তখনও অকাতরে ঘুমুচ্ছে। যাক্, তাহ'লে এখনও তার রাণীর সঙ্গে দিনের আলোয় চোখাচোখি হয়নি। ঘর বারান্দা সব দেখে, তাড়াতাড়ি সে নেমে এলো নীচের কলতলায়। কিন্তু কোথাও রাণীকে দেখতে না পেয়ে, আবার যখন উঠে এলো ওপরে, তখন দেখলো, আশীষ বিছানায় উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙছে, আর, সম্ভবত রাণীর সঙ্গে নূতন পরিচয়ের জন্যে চকিত চাহনিতে কেবলই দরজার দিকে চাইছে। চামেলী দ্রুতপায়ে তার সামনে গিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "দিদি আর খোকনকে তো দেখতে পাচ্ছিনা ?"

"সে কি !" তিন লাফ দিয়ে উঠে গেল আশীষ পাশের ঘরে। তারপর ওপরের পায়খানা, নীচের কলতলা, নীচের ঘরগুলি, ঘুঁটে কয়লার ঘুলঘুলি……। তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে নীচের ভাড়াটিয়া, রাণীর সেই চারুদি, জিজ্ঞাসা করলে, "কি খুঁজছেন ?" কোন জবাব না দিয়ে আশীষ ঝড়ের মত ওপরে এসে চামেলীকে চেপে ধরলে—"কখন উঠে গেছে বিছানা থেকে ?"

"কিছু তো জানি না, আমার তো এই……।"

"ন্যাকামো করো না বলছি; এক বিছানায় শুয়েছিলে, আর, পাশ থেকে একটা মানুষ উঠে গেল টের পেলে না?"

আশীষের বলার ভঙ্গীতে চামেলীর ভ্রু কুঁচকে উঠ্‌লো। "ও, এখন বুঝি আমাকে দায়ী করার চেষ্টা হচ্ছে? নিজে মুখে তাকে—'দূর হয়ে যাও সামনে থেকে—হেঁকে বলে দিয়েছো, মনে আছে"?

শিউরে উঠলো আশীষ নিজের কথা মনে করে।

"শুধু কি তাই? ঐ অতবড় ফুলদানিটা………!"

"—ওঃ"—পড়ে যাওয়ার মত হলো আশীষ যেন কোন এক দৈত্যের ধাক্কায়,—পাশের আলমারীটা ধরে সামলে নিলো যেন। তারপরই দুম্‌দাম, দুম্‌দাম্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। পাগলের মত তাঁকে বেরিয়ে যেতে দেখে, চামেলী কি ক'রবে কিছুই ঠিক করতে পারলো না। একবার ভাবলো, সেও ছুটে যায় পিছনে পিছনে তাঁকে ধরে আনতে, কিন্তু গেলো না। আবার ভাবলো, কতদূর যাবে? কোলে আছে রুগ্ন ছেলে, নিশ্চয়ই নিকটেই কোথাও আশীষ তাকে পাবে, এবং জোর করে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু সকাল গড়িয়ে পড়লো দুপুরের কাঠ-ফাটা রদ্দুরের কোলে,—দুপুর ক্রমে উঠে দাঁড়ালো তান্ত্রিকের ন্যায় কপালে রক্তচন্দনের তিলক পরে গোধূলির রক্তিম আভায়, তবুও আশীষ ফিরে এলো না।

চামেলীর নিজকে মনে হ'তে লাগলো, স্বেচ্ছায় লাফিয়ে প'ড়ে জালে আটকানো রোহিতের মতো। অনেক ঘোরাঘুরি পর, পশ্চিমের ঘরটাতে জানালার উপর বসে পড়লো সে, একেবারে অবসন্ন হয়ে। অস্তায়মান সূর্যের লাল আভা তার সুন্দর মুখখানিতে আবীর মাখিয়ে দিলো—ঠিক যেমন দিয়েছিলো একদিন রাণীর মুখে, যেদিন তাকে আশীষ প্রথম প্রাণভরে দেখেছিলো বীণার ঘটকালিতে।

আশীষ ও রাণীর মধুর দাম্পত্য জীবনের শত স্মৃতি মাখানো ঘরখানিতে, একাকী পরিত্যক্তার ন্যায় ব'সে, চামেলীর যে কত কি মনে হ'তে লাগলো তার ঠিকঠিকানা নেই। যে বালিশে মাথা দিয়ে রাণী রাত্রে শুয়েছিলো, চামেলী দেখলো তার ওপর ব্লু রংয়ের স্থতো দিয়ে বাহার করে লেখা তিনটি অক্ষর "আশীষ"; এর আগেই সে দেখেছিলো আশীষের বালিশটাতেও ঠিক অমনি ভাবে লেখা আছে, "রাণী,"। কত আদরের লেখা ওগুলো, লেখার পরে কতদিন কত আদরই না জমে উঠেছে ঐ বালিশের অদল বদলে। এইতো এতো মন কষাকষি চলছিলো, না জানি কতদিন ধরে, তবুও তো 'আশীষ' লেখা বালিশের ওপরেই রাণীর মাথা, আর 'রাণী' লেখা বালিশেই আশীষের মাথা না রেখে গতরাত্রেও তারা শোয়নি।

আশীষের ঘরের পূবের দেওয়ালে রাণীর একটা ফুল্ সাইজ ফটো মেট্রো প্যাটার্ণের ফ্রেমে বাঁধানো ছিল; চামেলীর চোখে পড়লো সেই বাদামী রঙের ফ্রেমের ওপরে ও ছবিতে আঁকা রাণীর পায়ের তলার যে দুগ্ধ-ধবল প্রশস্ত কাঠবোর্ড—তারই মধ্যে কেটে বসানো আশীষের হাতের লিখা "পথের মানিক!" চামেলী অবাক হয়ে ভাবে এর ব্যঞ্জনা কী হ'তে পারে। কিন্তু সে কী বুঝবে? দেখলো, ছবিতে যে রাণী ধরা পড়েছে, অতিশয় সলজ্জ তার ভঙ্গী, চকিত-চটুল চাহনি—তার মধ্যে যেন এক সহাস্য অনুশাসন! স্থতরাং চামেলীর এটা বুঝতে বাকী রইলো না যে, ছবিখানা রাণীর অমতেই জোর করে তুলে নেওয়া। অমনি তার মনে ভেসে উঠলো— কি সুন্দর সেই মুহূর্ত—যখন আশীষ জোর করে রাণীর অপ্রস্তুত অবস্থায় ফটো নিয়েছিলো! আর মনে হলো, এদের দাম্পত্য জীবন কত মধুর হ'লে তবে তার দুই একটা মুহূর্ত, এমন মাধুর্য নিয়ে এমনভাবে অমর হতে পেরেছে।

সে আর দেখতে পারলো না। তার যেন মাথা ঘুরতে লাগলো। কেন এলো সে উল্কার মতো এদের এই দাম্পত্য জীবনের মধুময় আকাশে বিপর্যয় ঘটাতে? কত বে-খাপ, বে-মানান, অবাঞ্ছনীয় সে এদের মাঝখানে! কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? তার কি দোষ এই নিদারুণ হৃদয় বিদারক ব্যাপারে? তার দোষ,—সে আশীষকে ভালবেসেছিলো। কিন্তু সে তো জানতো না, আশীষকে ভালবাসা তার উচিত নয়? আশীষতো তাকে জানায়নি কিছুই। তা ছাড়া আশীষের আবেদনেই সে সাড়া দিয়েছিলো, সে নিজে আশীষকে পাওয়ার স্পর্ধা রাখতো না। যাই হোক্, সে তো খালি ভালবাসেনি, একেবারে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছে আশীষের পায়ে। রাণীর মতো সেও চায় স্বামীর তৃপ্তিতেই তৃপ্তি। তবে? তবে সেও কেন সরে পড়ুক না আশীষের পথ থেকে? নিষ্কণ্টক করে দিক তার রাণীকে ফিরে পাওয়ার পথ? কিন্তু একি! বুক ভেঙে যায় যে তার এ কথা মনে করতে! চোখে নেমে আসে অশ্রু-প্লাবন!

সহসা তার বাহুতে শীতল স্পর্শ অনুভব করে চমকে উঠলো চামেলী। মন-ভাঙ্গা চিন্তার আলোড়নে সে জানতেও পারেনি কখন আশীষ নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢুকেছে। রাতও যে এতখানি হয়েছে,—ঘরের দরজা খোলা পড়ে রয়েছে, এ সব কিছুই তার খেয়াল নেই। আশীষের দিকে ফিরেই সে তার পায়ের ওপর উপুর হয়ে পড়ে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। আশীষ এর কোন অর্থ বুঝতে না পেরে, নিশ্চল পাথরের মত হয়ে বসে রইলো। চরম ব্যর্থতায় ও ক্লান্তিতে তার শরীর ও মন ভেঙে পড়েছে। চামেলীকে কখনও এমন ভাবে কাঁদতে না দেখলেও, তার কারণ জিজ্ঞাসা করা, বা সান্ত্বনা দেওয়া, কোন কিছুতেই সে এখন উৎসাহ পেলো না। চামেলীর অন্তরে ঝড় বয়ে যেতে পারে, কিন্তু তার অন্তরে

যা বইছে, তা কেবল ঝড় নয়, প্রভঞ্জন— একেবারেই প্রলয়ঙ্কর। এই প্রলয় থেকে তাকে যদি কেউ না উদ্ধার করে তবে আজই বুঝি তার জীবনের শেষ দিন! কারণ অনুতাপের দাবানল তার অন্তরে দাউ দাউ করে উঠেছে। অথচ এমন একজনও নেই, যার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সে একটু নিঃশ্বাস ছাড়তে পারে।

রাণী তো অকলঙ্ক রমণী-কুসুম! চামেলী ও নিষ্পাপ! তবে? তবে তো এই তিনটি নর-নারীর জীবন-নাট্যকে এক করুণ ট্রাজেডিতে পরিণত করার সমস্ত দায়িত্ব তার! কে এখন তাকে উদ্ধার ক'রবে? কোথা থেকেও কি তার পাপ-তপ্ত তৃষিত অন্তরে একবিন্দু করুণা-বারি বর্ষিত হবে না?

না, তার আর কোন ভয় নেই। চামেলীকে সে ডোবাতে পারে, কিন্তু চামেলীই তাকে বাঁচাবে। সে যেন এতক্ষণে আশীষের সমস্ত ব্যথা নিঃশেষে বুঝতে পেরেছে! তাই তার নিজের কান্নার ঢেউ থামতেই সে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে আশীষের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হলো।

বারো

সবে সন্ধ্যা হয়েছে। প্রশস্ত রাজপথ সহসা সেজে দাঁড়ালো তার রাজবেশে। তারা ফুটে উঠলো রাস্তার দুপাশের রূপালী রঙের বিজলী-পোস্টের মাথায় মাথায়। এযে প্রসাধনের সময়; ঘরে ঘরে এখন সীমন্তিনীরাও যেমন প্রসাধন-মত্তা, সুসজ্জিতা, এই রাজপথও তেমনি। তারও রূপের অন্ত নেই, অন্ত নেই তার সুর বিলাসের। রূপে রসে ও গন্ধে পথ এখন ভরপুর। দুপাশের বিপণী-শ্রেণী আলোক-মালায় সজ্জিত; প্রেক্ষা-মন্দিরগুলোর মাথায় আলোর টোপর, গলায় আলোর হার, কপালে মন-ভোলানো আলোর অক্ষর, বুকে আলো দিয়ে আঁটা নায়ক-নায়িকার ভাব বিলাসী যুগলমূর্তি,—সর্বাঙ্গ আলো-ঝলমল! পথের চৌমাথায় যেন আলোয় আলোয় লক্ষ মাণিক জ্বালা। সেখানে দোদুল দোলায় ট্রাম চলেছে যেন দেমাকী রাজনন্দিনী। আর তার দুপাশ দিয়ে সম্ভ্রম বজায় রেখে ছুটছে হরেক রকমের মোটর গাড়ী। বুকের মধ্যে বুঝি 'শিভাল্‌রির' ঢেউ খেলে যাচ্ছে তাদের। এদিকে ওদিকে সেদিকে, ছড়িয়ে আছে রঙীন বইয়ের স্টল, আছে ফল-ওয়ালা, ওজনের কল, পালিশের দল, বেলের গড়ে, রজনী-গন্ধার মালা, চাঁপার তোড়া, নিমের ডাল, ধূপ কাঠির ধোঁয়া, তিনপিস্‌ কাঠের উপর বসানো ছবির মেলা, স্নেহমাখা চীনা-বাসন, আর ও কত কি! আর সকলেরই মুখে নিজ নিজ হাঁক-ডাক, ইঙ্গিত ও সঙ্কেত। সকলের সব মিলে উঠেছে এক সান্ধ্য ঐকতান, সমগ্র সহর যাতে হয়ে উঠেছে আনন্দ-মুখর। সেই সহরের বুকের উপর দিয়ে, জন-সমুদ্রের মধ্য দিয়ে, সন্ধ্যাবেলা রাণী হেঁটে চলেছে

তো চলেছেই। পথ চলতে অনভিজ্ঞা সে। এক আশীষ ও চারুদি ছাড়া, পূর্ব্বে কখনও কলকাতার পথে একাকী চলাফেরা করেনি। বাস ও ট্যাক্সির বোঁ বোঁ শব্দে, রাণী কখনও ভীতা কখনও বা চকিতা হয়ে, রাস্তার এপাশে ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। আবার কখনও বা রাজপথ অতিক্রম করতে গিয়ে, গাড়ীর তলায় পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নেয়। এই ভাবে কয়েক মাইল চলার পর, ক্লান্ত দেহে টলতে টলতে এক সংকীর্ণ গলির সামনে এসে দাঁড়াল রাণী।

গলির মোড়ে তিনজন রমণী দাঁড়িয়ে জটলা ক'রছিল, রাধি, বামী, আর গোপী। পরিপাটী সাজসজ্জা, সর্বাঙ্গে গয়না, চেহারা মোটেই সুশ্রী নয়। তার উপর বেশী সাজসজ্জায় যেন কিছুটা বেমানান দেখাচ্ছিল। মুখে ফিস্‌ফাস্ কথা আর আগুন ঢালা হাসি। রাধির ইঙ্গিতে রাস্তার দিকে সচেতন হয়ে তাকায় বামী আর গোপী। মিট্‌মিটে গ্যাসের আলোতে দেখতে পেলো তারা, একজন রমণী একটি শিশু নিয়ে এগিয়ে আসছে তাদেরই দিকে। গোপী বামীকে একটা ধাক্কা মেরে বললে, "ওমা, এযে দেখি শ্যাম-চাঁদের বদলে রাইবিনোদিনী"...। 'তুই চুপ কর—মুখপুড়া, চুপ কর।" বলেই রাধি ঢাই করে মারলে গোপীর পিঠে এক চাটি। হেসে গড়িয়ে পড়লো গোপী, রাধি ও বামীর গায়। হাসতে হাসতে বললে গোপী, "ওমা, এযে দেখি সত্যিই আমাদের দিকে আসছে। কি রূপ দেখ ভাই—যেন স্বর্গের অপ্সরী! একে যদি আমাদের দলে ভিড়োতে পারি তাহলে কিন্তু বেশ হয়।"

বলে উঠলো বামী, "শুধু বেশ নয়রে,একেবারে যাকে বলে কিস্তি-মাৎ।" রমণীটিকে রাধি ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে বললে, "আমিও তাই ভাবছিলাম বামী।"

"ভাবছিলি তো বিহিত কর্।" এই বলে শরীর দুলিয়ে নড়ে-চড়ে দাঁড়ালো বামী।

"ঐ ভাখ্ না—এই দিকেই আসছে।"

"বলি, ও মেয়ে—শুনতে পাচ্ছ?" এই বলে রাধি এগিয়ে এসে রাণীর পথ আগলে দাঁড়ালো। এদের বাধা পেয়ে গলির মোড়েই খোকনকে বুকে চেপে থমকে দাঁড়ায় রাণী।

"বলি, এত রাতে—কোথায় যাচ্ছ তুমি?"

উদাস ভাবে বললে রাণী, "জা—নি—নে।"

"জানন? এতো ভারী মজার কথা বললে গো! এতরাত করে, কোলে ঐ কচি বাচ্চা নিয়ে, কোথায় যাচ্ছ, জাননা?" এই বলে তিন জনেই এক সঙ্গে হেসে উঠলো।

"আমায় পথ ছেড়ে দাও।' চঞ্চল হয়ে বললে রাণী।

"শোন্ মেয়ের কথা! আরে দেব বৈকি পথ ছেড়ে! বলি, পথ তো আর আমাদের একার নয় যে"—

"তুই বাজে বকিস্নি—বাজে বকিস্নি রাধি," বলেই গোপী ওদের সরিয়ে দিয়ে, রাণীর একখানা হাত ধরে বললো, "কার সন্ধানে যাচ্ছ তুমি?"

"আ—মি—আ—মি,"! বলেই অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকায় রাণী তাদের দিকে। বললে, "পথের সন্ধানে।" বলতে বলতে রাণীর গলার স্বর ভারী হয়ে ওঠে।

"পথের সন্ধানে?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে ওরা!

সজল চোখে বললে রাণী, "হ্যাঁ, এখন আমায় যেতে দাও।"

"তাতো দেবো মেয়ে।—আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস তোমার কে আছে?"

মাথা নেড়ে বললে রাণী, "কেউ নেই আমার।"

"কেউ নেই! তবে এত রাত করে—কোলে ঐ কচি বাচ্চা নিয়ে —"কোথায় যাবে তুমি?"

পেছন থেকে দপ্ করে বলে উঠলো গোপী—"পথের সন্ধানে।"

"আঃ, চুপ করলি গোপী," এই বলে রাধি গোপীকে সে স্থান থেকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে, রাণীকে বললে, "এসো না আমাদের কাছে। আমরা আশ্রয় দেবো তোমাকে। তাহ'লে আর তোমাকে পথের সন্ধানে এমন করে ঘুরতে হবেনা। কি বলো? আসবে?"

বামীর কথায় যেন অকূলে কূল পেল রাণী। তবুও ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, "সত্যি—আমায় তোমরা রাখবে?"

"কেন রাখবোনা মেয়ে। আমাদের তো এই কাজ, যারা অসহায় ও নিরাশ্রয়, একমুঠো অন্ন যাদের একবেলা জোটেনা, আমরা যে বোন তাদের—।"

রাধির কথায় হেসে লুটিয়ে পড়ে গোপী আর বামী। রাধির কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, বাবাঃ, "এমন গুছিয়ে বলতেও পারিস!"

মনে মনে হাসে রাধি।

তারপর এক প্রকার জোর করেই রাধি রাণীকে নিয়ে গলিটা পার হ'য়ে সামনেই একটা বাগান বাড়ীতে ঢুকে পড়ল। বামী ও গোপী তাদের পিছু পিছু মন্থর গতিতে যেতে লাগলো।

ঘরে ঢুকে রাণী একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে, সমস্ত হলখানা জুড়ে গালিচা পাতা। দেওয়ালে আটকানো বড়ো বড়ো কয়েক-খানা অর্দ্ধ-উলঙ্গ নারীমূর্তি। গালিচার মাঝখানে কতগুলি মদের বোতল, তবলা বেহালা সাজানো। এধারে ওধারে কয়েকখানা সোফা পাতা। এসমস্ত দেখে রাণীর গা কেন যেন শিউরে ওঠে। এখানকার আবহাওয়া এদের কথাবার্তা কেমন যেন লাগলো

তার। বিস্মিতা ও ভীতা হয়ে তাকায় সে ওদের দিকে। বললে অস্ফুটস্বরে, "একি! এ কোথায় আমায় নিয়ে এসেছ?"
রাণীর কথায় খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল রমণী তিনজন। সেই সঙ্গে দু'জন যুবকেরও অশ্লীল হাসি শুনতে পেল রাণী। রাণীর বুক কেঁপে উঠল দুরু দুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে ঘর ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করতে, রাধি ও বামী টেনে ধরলো তাকে পেছন থেকে। পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রীর মতো উন্মত্ত হয়ে উঠল রাণী। সজোরে এদের হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে।
রাধির বকুনীতে মাতাল দু'জন কিন্তু টল্‌তে টল্‌তে ছুটলো রাণীকে লক্ষ্য করে। এদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে রাণীও ছুটতে লাগল প্রাণপনে। আতঙ্কে বারে বারে পিছন ফিরে তাকায় সে। দেখতে পায় মাতাল-দের—ভয়ে শিউরে ওঠে আবার। এভাবে কিছুক্ষণ কাটবার পর, রাণী এসে দাঁড়াল একটি বাড়ীর সামনে, দরজায় ধাক্কা মারলো জোরে। দরজা ধাকার আওয়াজে ভেতর থেকে রুক্ষস্বরে সারা এলো—"কেরে বাবা, এত রাতে মরতে এসেছো! আচ্ছা জ্বালাতন! সারাদিন হারভাঙা পরিশ্রম করে যদি একটু বিশ্রাম করবার—ফুরসুৎ...... ।"
বলতে বলতে দরজাটা দড়াম করে খুলে দাঁড়ায় মধ্যে বয়সী একটি স্ত্রীলোক। গলা বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, "কে, তুমি? রাত দুপুরে........ ?"
"আ—মা—য়, আ—মা—য়, একটু আশ্রয়।" হাঁপাতে হাঁপাতে বললে রাণী।
"হুঁ, আশ্রয়," মুখ খিচিয়ে ওঠে স্ত্রীলোকটি। "বেরোও, দূর হয়ে যাও, আশ্রয় মিলবে না এখানে।" বলতে বলতে বৃদ্ধা তখনই দরজাটা রাণীর মুখের উপরেই দুম্‌ করে বন্ধ করে দিলে।
অসহায় রাণী বিমুখ হ'য়ে, আবার ছুটতে থাকে একটু আশ্রয়ের

আশায়। কিন্তু পা যেন আর চলতে চায় না তার, হাত পা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আসছে, পিপাসায় বুক শুকিয়ে গেছে, চোখে দেখছে অন্ধকার। তবুও এই অবস্থায় খোকনকে শক্ত করে ধরে আছে তার বুকে। এদিকে মাতালেরা তার পিছু ছুটছে। দিশেহারা হয়ে ছুটতে থাকে রাণী পাগলের মতো। ছুটতে ছুটতে সামনেই আর একটী বাড়ীর দরজায় এসে পুনরায় ধাক্কা মারলে সজোরে। ভয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, "কে আছ ঘরে, রক্ষা করো, রক্ষা করো।"

দরজা ধাক্কার প্রচণ্ড শব্দে ও মেয়ে মানুষের ভয়ার্ত কণ্ঠ শুনে, দরজা খুলে দাঁড়ায় এক বৃদ্ধ। দরজা খুলতেই রাণী জ্ঞান হারা হ'য়ে পড়ে যায় দোরগোড়ায়। বৃদ্ধ যে এরূপ অবস্থায় পড়বে, তা কল্পনাও করতে পারিনি সে। হতবুদ্ধি হ'য়ে তাকিয়ে থাকে সে মূর্চ্ছিতা রমণী ও তার শিশুটির দিকে। হঠাৎ খোকন কেঁদে ওঠে চিৎকার করে। কান্নাতে বৃদ্ধের চৈতন্য ফিরে আসে। রাণীর কোল থেকে রোরুদ্যমান খোকনকে কোলে তুলে নিয়ে, ব্যস্তভাবে চিৎকার করে ডাক্‌তে থাকে, "নিমি, নিমি, বলি নিমি, জেগে আছিস্ ?

জগুর ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে যায় নিমির। শয্যার উপর উঠে বসে, বিরক্তির সুরে বললে, " বলি কি হয়েছে দাদা ? তুমি নিজেও ঘুমুবে না, আমায় ও ঘুমুতে দেবে না ?"

"এদিকে আয় না শীগগীর ! কি বিপদ দেখে যা !"

"বিপদ ? সে আবার কি !" দুচোখ কপালে তোলে নিমি। তাড়াতাড়ি শয্যা থেকে লাফিয়ে পড়ে, দাদা, ওরফে জগুর ঘরে ঢুকে, তাজ্জব বনে যায় সে। গালে হাত দিয়ে বললে, "এ্যকি আপদ !"

"আপদ নয়রে, আপদ নয়, বিপদ।"

"তাতো বুঝলুম বিপদ, কিন্তু এরা কে দাদা ?"

"দ্যাখ্‌না কাণ্ড—মেয়েটা 'রক্ষা করো, রক্ষা করো' বলে দরজায় অনবরত

যা দিচ্ছিল। আমি ওর চিৎকার শুনে দোরটা খুলতেই—এ মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়ে গেল মাটিতে! এই খোকাটি ওর কোলেই ছিল। কান্নাতে আমি কোলে তুলে নিলুম।"

"তাতো বুঝলুম।" মুখ নেড়ে বললে নিমি। "এখন একে নিয়ে কি ক'রবে?"

'ওকে আগে বাঁচা নিমি। ওর জ্ঞান ফিরে এলে—ব্যাপারটা কি—সব জানতে পারবো।"

"কিন্তু দাদা আমার একটা কথা।"

"কি কথা?"

"আমি হলুম বিধবা মানুষ। থাকি দু'খানা ঘর নিয়ে কোন মতে ভাড়া চালিয়ে। দিন আনি দিন খাই। তাই বলছি—আমি কিন্তু এর ঝামেলা বইতে পারবো না। তা আগেই জানিয়ে রাখছি বাপু।"

"আচ্ছা নিমি, বলি, তোর হ'লো কি? বুড়ো হ'তে চল্‌লি, দুদিন পরে তোকেও আমার মত তৈরী হতে হবে মরবার জন্যে। তা তোর স্বভাবের কি একটুও পরিবর্তন হবেনা?"

দুহাত নেড়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিলো নিমি—"সে যাই বলনা দাদা। আমি হলুম স্পষ্টবাদী। যা বলার, তা ঐ মুখের উপরেই বলবো। লুকোচুরির কিচ্ছুটি নেই। এতে তোমরা যে যাই মনে করোনা কেন বাপু! তুমি দিন কয়েকের জন্যে থাকতে এসেছ থাকো। কিন্তু এসব ঝক্কি নিতে পারবো না আমি।"

অসন্তুষ্ট হয়ে বললে জগু—"না পারলি। আপাততঃ ওর মূর্চ্ছাটা ভাঙুক। যা জল নিয়ে আয়।"

জগুর কথায় নিমি গজ্‌রাতে গজরাতে জল এনে, রাণীর মাথায় ঢালতে ঢাল্‌তে বললে—"যদি এ ভালো হয়ে বলে আমার দুনিয়ায় কেউ নেই—তখন্ তুমি কি করবে?"

"কি করবো আবার! যখন ও আশ্রয় পেয়েছে—তখন আর ওকে ফেলতে পারবো না।"

"ফেলতে পারবেনা বললে—কিন্তু, রাখবে কোথায় শুনি?"

"আমার বাড়ীতে।"

জলের ঝাপ্‌টা দিতে দিতে মুখ বেঁকিয়ে বললে নিমি—"বাড়ীতো বাড়ী—ঐ তো দুখানা কুঁড়ে ঘর নবদ্বীপে। আচ্ছা—সেই কুঁড়ে ঘরে নয় নিয়ে রাখবে। তারপর—খাওয়াবে কি? দুনিয়াতে তো এই নিমি ছাড়া আর কেউই নেই। বুড়ো বয়সে নিজের পেটই চালাতে পারছো না, তার উপর আবার এ বোঝা কি করে বইবে শুনি?"

"সে যে করেই হোক্, একভাবে চলেই যাবে। জানিস্ নিমি, ওকে দেখে অবধি কেন যেন আমার এতকাল পরে সরস্বতীর কথা মনে পড়ছে। ঠিক এমনি রূপই ছিল আমর সরস্বতীর। সেই মেয়েকে বুড়ো বয়সে হারিয়ে, কতনা দেশ বিদেশে ঘুরে বেরিয়েছি পাগলের মতো। এরকম একটি মুখ দেখ্‌বো বলে। বলতে জগুর চোখ-দুটী সহসা জলে ভরে উঠলো। চোখের জল সম্বরণ করে, নিমির দিকে তাকিয়ে বললে,—"হ্যাঁরে নিমি, এর যদি কোন আত্মীয়স্বজন না থাকে, তা হ'লে কিন্তু বেশ হয়! আমি ওকে আমার সরস্বতীর মতো করে আমার কাছে কাছে রাখি!"

মুখ বেঁকিয়ে বললে নিমি, "পোড়াকপাল আর কি, বুড়ো বয়সে আবার এসব সখ কেন?"

একটু আঘাত খেয়ে বললে জগু, "ওরে নিমি, তোর তো সন্তান নেই তাই তুই জানিস্‌নে সন্তান মা বাপের কি জিনিস। ওকে দেখে অবধি আমার অন্তরে পুরানো স্মৃতি জেগে উঠছে, বারবার করে।

মনে পড়ছে আমার সরস্বতীকে। এমনি ছিল দেখতে আমার সরস্বতী—।”

একটা ঝাঁজি দিয়ে ওঠে নিমি, “বলি দাদা, ওসব সুখ-দুঃখের কথা শুনবার সময় আমার নেই। রাতটুকু পোহালেই পেটের দায়ে বেরতে হবে বাইরে। তবে হ্যাঁ, তাহ'লে তোমার সঙ্গে কিন্তু ঐ কথাই রইলো। যাবার সময় তুমি ওদের সঙ্গে করে নিয়ে যেও।” ঘুমন্ত খোকনকে শয্যায় শুয়ে দিতে দিতে কি জানি ভাবতে থাকে জগু।

জগুর কোন সাড়া না পেয়ে চটে ওঠে নিমি। বললে, “কি সাড়া দিচ্ছনা যে বড়ো? কথাগুলো বুঝি মনঃপূত হ'লোনা, না?”
“আঃ চট্‌ছিস কেন নিমি বলতো? ঝাঁজি ছাড়া যে তুই কথা বলতেই পারিস্‌নে। শোন্ না!” শান্তভাবে বললে জগু।

“কি শুনবো?”

“বলছিলাম কি আমি কালকেই যাবো নবদ্বীপে।”
“য়্যা! তোমার মতলব তো ভাল নয় দাদা। এখন বুঝি পথ না পেয়ে সরে পড়তে চাও?”

অপ্রস্তুত হয়ে বললে জগু, “আরে মুশিকল, সরে পড়বো! তুই একথা কি করে বলতে পারলি নিমি?”

“তোমার হাব-ভাব আমার কাছে মোটেও ভালো ঠেক্‌ছেনা গো দাদা।”
“আরে, নারে না—ওদের ব্যবস্থার জন্যেই আমি যেতে চেয়েছিরে!” বলে তাকায় নিমির মুখের দিকে। পুণরায় বললে, “তুইতো জানিস্‌, নবদ্বীপে ভাঙা ঘরে কোনমতে মাথা গুঁজে থাকতুম আমি। বুড়ো মানুষ—কোন কিছুর বালাই ছিলনা আমার। কিন্তু এদের তো অমন ভাঙা ঘরে তোলা যায় না। তাই যেতে চেয়েছি, ঐ

ভাঙা ঘর দু'খানা ঠিক করে নিতে যে ক'টা দিন লাগে। শুধু সে ক'টা দিন তুই ওদের একটু দেখা শোনা করিস্।"

"না, না, সে হবেনা দাদা, গর্জে ওঠে নিমি।"

"তুমি একেবারে এদের সঙ্গে নিয়ে যাবে। এসব ঝামেলা পোহাতে পারবো না আমি। আগেও বলেছি, এখনও বলছি।"

বিবর্ণ মুখে জগু তাকায় নিমির দিকে। হতাশ হয়ে শেষে বললে সে—"আচ্ছা তাই হবে।"

তেরো

আশীষের উপর অভিমান করে রাণী বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার পর থেকেই আশীষ যেন কেমন হয়ে গেল। সদাই অন্যমনস্ক ভাব, কাজ কর্ম্মে একটুও মন নেই। সব উৎসাহ ও আনন্দ যেন ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেছে রাণী। রিহার্স্যালে মন বসাতে আর পারলে না সে। কাজেই বিরক্ত হয়ে, ম্যানেজারবাবু তাকে চাকরি থেকে দিলেন বরখাস্ত করে। এক তীব্র অনুশোচনা সর্বক্ষণ দগ্ধ করতে থাকে তার মনকে। শুয়ে শুয়ে আশীষ ভাবে—ভাবে অনেক কিছুই। তার জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বেশ তো ছিল সে রাণীকে বিয়ে করে। বেশ কেন, খুবই সুখী হয়েছিল সে—রাণীকে ঘরে এনে। কি অপরাধ করেছিল সে যার জন্যে তাকে অপমানের চূড়ান্ত করে, তাড়িয়ে দিলে সে বাড়ী থেকে! ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল দেওয়ালে টাঙানো রাণীর জ্বলজ্বলে ফটোখানার দিকে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কি যেন চিন্তা করতে থাকে সে। হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে এগিয়ে আসে ফটোখানার কাছে। অস্বাভাবিক তার দৃষ্টি—অস্বাভাবিক তার দাঁড়ানোর ভঙি—আর অস্বাভাবিক তার মুখের চেহারা। চেঁচিয়ে ওঠে সে, "হ্যাঁ, দোষী। তুমিও দোষী ছিলে বৈকি রাণী। তা না হ'লে কি এমন কখন ঘটতে পারতো?" সজোরে দু'হাতে ফটোখানা দেওয়াল থেকে টেনে খুলে নেয়। বুকে আঁকড়িয়ে ধরে সযতনে। বলতে থাকে, "না, না, এ আমারই ভুল। তোমার কী দোষ? স্বামী বেকার থাকলে কোন মেয়ের তা ভাল লাগে? তুমিও তাই চেয়েছিলে আমার বেকারত্ব ঘুচিয়ে,

আমারই মনের অশান্তি দূর করতে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দু'জনেরই জীবনকে মধুময় করে তুলতে! কিন্তু তাই বলে কি এমনি হবে?" তার মনে পড়লো সেদিনের কথা, যেদিন রাণীর খুঁতুনীতে বিরক্ত হ'য়ে বের হ'য়েছিল সে চাকরির চেষ্টায়। জুটে গেল চাকরি। তারপর কি যে হ'লো, কেন তার এমন দুর্বুদ্ধি হ'লো মিথ্যে কথার জাল বুনতে। প্রথম যেদিন সে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা হিসেবে রিহার্স্যাল দেবার জন্যে উপস্থিত হয়, শুধু সেই একটি দিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে, তার সুখের সংসারে এমন ভাঙন লাগবে, এমন ভাবে ওলোট-পালোট হয়ে যাবে, তা সে কোনদিনই কল্পনা করতে পারেনি। সেদিন ছিল রিহার্স্যালের দিন। সমস্ত অভিনেতা, অভিনেত্রী উপস্থিত রিহার্স্যাল দেবার জন্যে। তাদের মধ্যে নবাগত আশীষ ও বটপাল সামন্ত নামে এক অভিনেতাও উপস্থিত ছিল।

বেশ হাস্য-রসিক এই বটপাল সামন্ত। তার রসিকতার জন্যে যেমন সকলেই তাকে নিয়ে হাসি তামসা করতো, আবার তার হাসি শুনলে পিলে উঠতো চমকে। অদ্ভুত সে হাসি। অদ্ভুত তার আওয়াজ। সমস্ত হলখানা সেই হাসির গুম্‌গুম্‌ শব্দে প্রতিধ্বনিত হয়ে কাঁপতে থাকতো। তার মুখশ্রী ছিল যেমন অদ্ভুত, তেমনি বিশাল ছিল তার দেহ। চোখ দুটি তার জ্বলজ্বলে, তার উপর অস্বাভাবিক ছোট। রক্তবর্ণ তার দৃষ্টি—দেখে মনে হ'তো, যেন তার ইচ্ছে হলেই সব কিছু ভস্ম করে দিতে পারে অনায়াসে, এক নিমেষে, আগুনের মতো। হাত ও পায়ের এক একটা পাঁজা যেন ভীমের মতো। বিরাট কুৎসিত তার দাঁতের পাটি। উঁচু নীচু, বড় বড় কোদালে তার দাঁত। তেমনি অদ্ভুত তার গোঁফ-জোড়া। বিরাট গালের দু'পাশ দিয়ে বেড়িয়ে ঘাড় পর্য্যন্ত

হাঁটা করেছে। চেহারাটা তার কিম্ভূতকিমাকার হোলেও অল্পদিনের মধ্যে বেশ নাম কিনেছে সে, দৈত্য, দানব, ডাকাত আর সর্দারের ভূমিকায় অভিনয় করে। সেদিন রিহার্স্যালের দিন। "কর্ণার্জ্জুন"। বটপালকে দেওয়া হয়েছিল ভীমের পাট। বটপাল সামন্ত যখন তার বিশাল দেহ নিয়ে, আশীষ, ওরফে দুর্য্যোধনকে, গালি দিতে দিতে, গদা হস্তে দৈত্যের মতো আক্রমন করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন অনভিজ্ঞ নবাগত অভিনেতা আশীষ, বটপালের সেই ভীষণ মূর্তিখানা দেখে, বেশ কিছু ভয় পেয়ে, ঘাবড়ে, দু'পা পিছিয়ে যেতেই হঠাৎ হুড়মুড় করে অভিনেত্রীদের সামনে পড়ে গেল ।

তারপর হলে যা হবার তাই হলো। হাসির চোটে সমস্ত হলখানা যেন ফেটে পড়লো। ম্যানেজারবাবুও মুচ্‌কে হাসলেন। কিন্তু হাসলোনা শুধু একটি অভিনেত্রী। কারণ, আর কেউ বুঝতে না পারলেও সে বুঝেছিল, আশীষ শুধু প'ড়েই যায়নি, আচমকা এক চোট পেয়েছেও বেশ। বাঁদিকের কোণে যে ভারী কাঠের পুরোনো টেবিলটা ঠেলা ছিল, হুঁচোট্ খেয়ে প'ড়বার সময় তার মাথাটা সোজা গিয়ে পড়ে তারই এক কোণার ওপর।

এই অভিনেত্রীই হলো চামেলী। সে দেখলো, চোট খেয়ে উঠেই, সকলকে হাসতে দেখে, আশীষও মুখ রক্ষার জন্যে সেই হাসিতে যোগ দিল। কিন্তু এটা যেন সে কেমন করে বুঝতে পারলো যে, নিশ্চয়ই এই গুরুতর আঘাতে আশীষের মাথা ঘুরছে। তাই ত্রস্ত গতিতে এগিয়ে এলো সে আশীষের সামনে। ব্যস্ত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে চামেলী দু'খানা হাত ধরে তাকে তুলে বসালো পাশের একখানা চেয়ারে। অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থ করেও তুললো তাকে। তারপর সকলের ঠাট্টা বিদ্রূপ ভ্রূক্ষেপ না করে, আশীষকে যত্ন

করে গাড়ীতে তুলে, তার বাড়ীর কাছে পৌঁছে দিয়ে, বাড়ী ফিরেছিল। চামেলীর এমন ব্যবহারে সেদিন আশীষ শুধু মুগ্ধই হ'ল, তা নয়। চামেলীর আদর যত্নে ভুলে গেল সে সব কিছু। হারিয়ে ফেললো সে নিজেকে এবং একটা সামান্য উপকারের প্রতিদানে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে ফেললো। তার আচরণ দেখতে দেখতে সৌজন্যের গণ্ডী পেরিয়ে উপরাঙ্গে উঠতে লাগলো। আশীষের এই মোহের জালে মুগ্ধা তরুণীর স্বভাব সুলভ দুর্বলতায় চামেলীও ধরা পড়লো। চামেলী বুঝি ভেবেছিল সহসা স্বর্গ নেমেছে তার এই পতিত-প্রায় জীবনের অঙ্গনে। সবই হ'লো, শুধু আশীষ তার বিয়ের কথা গোপন রাখলো চামেলীর কাছে।

এসব ভাবতেই ভীষণভাবে পায়চারি করতে থাকে সে। অসংখ্য প্রশ্ন তার মনে তোলপাড় করতে থাকে। কেন তার এমন দুর্বুদ্ধি, এমন ভীমরতি হয়েছিল সেদিন? কেন সে চামেলীর কাছে প্রকাশ করতে পারলেনা যে সে বিবাহিত? ঘরে তার লক্ষ্মী প্রতিমা স্ত্রী আর একটি ফুলের মতন শিশু বর্তমান। কোথা থেকে দুর্বলতা এসে তাকে বাধা দিলে? কেন পারলেনা সত্যি কথা প্রকাশ করতে? সে কি চামেলীর রূপ আর যৌবন দেখে? কিন্তু রাণীরও তো রূপ ছিল, যৌবন ছিল! তবে—কিসের মোহে? কি করে সে ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেল রাণীকে? চামেলীর বা কি দোষ ছিল এতে? সুন্দরী, বয়স্থা, কুমারী মেয়ে। আর সে তার কাছে, অবিবাহিত বলে পরিচিত। তার উপর সুন্দর সুপুরুষ যুবক। কাজেই বয়সের দোষেই হোক্, কিংবা রূপের মোহেই হোক্, সচরাচর আর পাঁচজন যুবক যুবতীর মতো, তারাও পরস্পরকে ভালবেসে ফেলেছিল। এসব কথা ভাবতেই আশীষ উত্তেজিত হ'য়ে উঠে! নিজের উপর একটা ঘৃণা এসে যায়। শুধু বারে বারে নিজের মনে

উচ্চারণ করতে থাকে সে, "এ দু'টি জীবনই ব্যর্থ করে দিলুম আমি! আমার কেন এমন দুর্মতি হ'ল?" বলে নিজের মাথার চুল নিজেই টানতে থাকে পাগলের মতো।

এমন সময় পেছন থেকে কার দুটি কোমল বাহু স্পর্শ করে আশীষকে। হকচকিয়ে যায় আশীষ। অস্বাভাবিক ভাবে বললে, "কে! কে তুমি?"

অপরাধীর মত তাকায় চামেলী আশীষের দিকে। বললে, "আমি।"

"তুমি!"

"হ্যাঁ আমি।" দুহাতে দিয়ে জড়িয়ে ধরে আশীষের কম্পিত দেহখানা। বললে "বড্ড অসুস্থ মনে হচ্ছে তোমাকে। এত কি ভাবছো?"

"আচ্ছা চামেলী, বলতে পারো, ভালবাসা কি পাপ?" বলে তাকায় সে চামেলীর দিকে।

এড়িয়ে যায় চামেলী আশীষের প্রশ্ন। মিনতি করে বললে, "এসব কথা থাক্ এখন।"

"না আগে বলো তুমি, ভালবাসা কি অপরাধ—ভালবাসা কি পাপ?"

"কে বললে ভালবাসা অপরাধ, ভালবাসা পাপ! পাপও নয়, অপরাধও নয়"। বলে চামেলী কোনমতে চোখের জল সংবরণ করলে।

"সত্যি, সত্যি, বলছো তুমি?"

"হ্যাঁ।" ভারী গলায় সাড়া দিলে চামেলী। "চলো একটু বিশ্রাম করবে।" এই বলে চামেলী একরকম জোর করে আশীষকে টেনে নিলে শয্যায়।

কোন প্রতিবাদ না করে শুয়ে পড়ে সে চোখ বুঁজে।

শিয়রে বসে চামেলী। হাত বুলিয়ে দেয় আশীষের মাথায়। ধীরে ধীরে আশীষ চামেলীর ডান হাতখানা টেনে তার বুকের উপর শক্ত করে চেপে ধরে। উভয়েই নীরব। কোন কথা নেই, কোন সাড়া নেই। হঠাৎ চামেলীর অজ্ঞাতে তার চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল আশীষের হাতের উপর! চোখ মেলে তাকায় আশীষ চামেলী মুখের দিকে। বললে, "তুমি কাঁদছো চামেলী?"

চামেলী নীরব। নিস্তব্ধ। কোন্ সাড়া দেবে সে? হয়তো তাকে জীবন ভরেই এমনি করে ফেলতে হবে চোখের জল।

চামেলীর হাতখানা সরিয়ে; একটু অপ্রস্তুত হয়ে, উঠে পড়ে আশীষ বিছানা ছেড়ে। বললে, "না—না—ছিঃ, একি করছি আমি! চামেলী! একি করছি? যে গেছে, সে গেছে। এক দিকের ঝঞ্ঝাট চুকে গেছে!"

"একি বলছ তুমি! একখনও হ'তে পারে না, যে পর্য্যন্ত দিদিকে তুমি তোমার ঘরে ফিরিয়ে না আনবে।"

"আগেও বলেছি আজও বলছি, আমার কথা রাখো। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দাও, দিদি আর খোকনের যে সন্ধান দিতে পারবে, সে অনেক টাকা পুরস্কার পাবে। আর, বিজ্ঞাপন দিয়ে, চুপ করে ব'সে থাকলে চলবেনা, জায়গায় জায়গায় লোক পাঠিয়ে অনুসন্ধান ক'রতে হবে। দেখবে—নিশ্চয় দিদিকে ফিরিয়ে পাবে তুমি।"
"তাহলে তুমি, রাণীকে ফিরিয়ে আনতে বলছো?"
"এতক্ষণ তবে কি শুনলে! কি বললুম আমি!"
"কিন্তু, তাতো--হবার নয় চামেলী!"
"কেন—কেন হবার নয় শুনি?"

উত্তর দিতে গিয়ে আশীষ শুধু একটু হাস্‌লো। সে বড়ই করুণ—বড়ই মর্মান্তিক সে হাসি।

চামেলী আশীষের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "বলো কি দোষ করেছেন তিনি ?"

"দোষ! না—কোন দোষ করেনি সে।"

"তবে ?"

"কারণ আছে চামেলী। সে সব আমি তোমায় বোঝাতে পারবো না।" বলেই সে পায়চারি করতে থাকে আবার।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চামেলী তাকায় বাইরের দিকে উদাসভাবে। বললে, "তা তুমি আমায় না বোঝালেও, আমি সব বুঝতে পারি। তুমি কি আমায় এতই স্বার্থপর ভেবেছ ? আমায় তুমি আজও চিনলে না! আজও বুঝলেনা!" ধরাগলায় বললে চামেলী।

অধীর আগ্রহে এগিয়ে এসে একখানা হাত চেপে ধরে আশীষ। "তোমায় কি আজ নতুন করে চিনবো চামেলী ? তোমায় আমি চিনেছি সেইদিনই, যেদিন তুমি অন্তর্যামীর মতো আমার আঘাতের কথা বুঝতে পেরে, অন্তরের সমস্ত দরদ উজাড় ক'রে দিয়েছিলে সকলের সমস্ত বিদ্রুপ উপেক্ষা ক'রে। তবে সে হলো একরকম—এখন যে আর একরকম ক্ষেত্র দাঁড়িয়েছে। তুমি আমায় দু'হাতে তুলে ধরে দিয়েছো তোমার বুকের অমৃতভাণ্ড, আর আমি যে তার প্রতিদানে দিলাম তোমারই কণ্ঠে গরল ঢেলে নির্মম ভাবে......"

চামেলী উঠে দাঁড়িয়েই তার ডান হাত আশীষের মুখ চেপে ধরে বললো, "বলোনা, বলোনা, তুমি অমন করে!" বলতে বলতে তার গলা ধরে এলো, আর সে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে আশীষকে জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে একবার কেঁদে উঠ্‌লো।

কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে যাওয়ার পর আশীষ ডাকলো, 'চামেলী'! চামেলী মুখটা উঁচু করে তাকালো আশীষের মুখের দিকে।
আশীষ বলে গেল,—"চামেলী, তুমি রাণীকে ফিরিয়ে আনতে বলছো। তাকে যদি খুঁজে ফিরিয়ে আনি, সত্যি, সইতে পারবে ?" চামেলীর হাতখানায় একটু চাপ দিয়ে বললে সে।

তাকিয়ে থাকে চামেলী আশীষের দিকে জলভরা নয়নে। বললে, "তুমি আমায় পরীক্ষা করছো ?" বলতেই চোখ দুটি দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে চামেলীর! কিন্তু সে বেশীক্ষণ নয়। তখনই চোখের জল সংবরণ করে ধীরভাবে বললো, "আমায় বুঝি বিশ্বাস করতে পারছোনা ?—কি করে করবে বলো ? যে জায়গা থেকে তুমি আমায় কুড়িয়ে নিয়েছো, সেখানে সত্যিই বিশ্বাস করার মতো মেয়েরা থাকে না। আমিও হয়ত তাদেরই দলে ভিড়ে যেতাম যদি তোমার দেখা না পেতাম।" দুজনেই এখন বসে বসে কথা বলছিলো, আশীষ দেখলো এই কথা কয়টা বলার সঙ্গে সঙ্গে চামেলীর ডান হাতটা তার পায়ের উপর গিয়ে পড়লো, বাঁ হাতটা এখনো আশীকে জরিয়ে আছে। চামেলী বলে গেল, "তুমি একটা ভুল করতে পারো, ভুল তো মানুষ মাত্রেরই হয়; কিন্তু তোমার ভুলের বিচার ক'রবার আমি কে ? তোমার কাছে থেকে আমি যা পেয়েছি, আমার কাছে তার যে আর তুলনা নেই—" নির্নিমেষ নেত্রে চেয়েছিলো আশীষ চামেলীর মুখের দিকে। শেষের কথাটায় সে যেন চমকে উঠ্‌লো। "কি বলছো, চামেলী, আমি তোমার সর্বনাশ ক'রলাম, আর তুমি কিনা বলছো······ "
আবার আশীষের মুখে হাত চাপা দিলো চামেলী। "তোমার পায়ে পড়ি, অমন কথা বলো না। দেখো, যেদিন আমার বাসায় প্রথম তোমার পায়ের ধুলো পড়েছিল, সেইদিনই আমি আমার জীবন সার্থক

মনে করি। ঐ পায়ের ধূলোর বেশী আমি আর কিছুই স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি; তোমার বুকে স্থান পাওয়া আমার পক্ষে স্পর্ধার কথা। তবু, কেন জানিনা, সেই স্পর্ধা তুমিই আমাকে দিয়েছো। তা আজ যদি আবার সেই স্পর্ধা থেকে মুক্তি দিয়ে তুমি আমাকে কেবল চরণেই স্থান দাও তবে……" সহসা চামেলীর দুটো হাতই এসে পড়লো আশীষের দুটো পায়ের ওপর, জোরে চেপে ধরলো সেই পা-দু'খানা, আর মুখখানা সে লুকিয়ে ফেললো আশীষের দুই হাঁটুর মাঝখানে। আশীষ বুঝতে পারলো, চামেলীর তপ্ত অশ্রুধারা অজস্রধারে বর্ষিত হয়ে তার পা দুখানা ভিজিয়ে ফেলছে। সে একবারে হতভম্ব হয়ে গেল চামেলীর এই আচরণে। কিন্তু তার যেন চামেলীর মুখের কথা শোনবার আগ্রহ ক্রমশই বাড়তে লাগলো। তাই জিজ্ঞাসা করলো তার অশ্রুভরা মুখখানা তুলে ধরে, "তবে কি ?"

"তবে কি আমার সৌভাগ্য কিছু কম হবে, বলো ?"—কি শান্ত, অবিচলিত তার কণ্ঠস্বর ! আশীষ এর কি জবাব দেবে ? তার ইচ্ছা হচ্ছিল সে বলে, "চামেলী, আজ কার সঙ্গে যে তোমার তুলনা দেবো, সত্যিই আমি নিজেই বুঝতে পারছিনে ? তুমি দেবী না মানবী ? স্নেহে, প্রেমে, উদারতায় ও মহত্বে ভরা তোমার হৃদয় ! জগতের সমস্ত গল্প-উপন্যাস ঘাঁটলেও তোমার মতো এমন মধুর একটি নারী চরিত্র মিলবে না।"

কিন্তু তার কিছুই বলা হ'লো না। তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বিষাদের হাসি হাসে চামেলী। মোলায়েম ভাবে বললে, "তার জন্যে ভেবনা, দিদির জন্যে সব কিছুরই ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী আছি আমি ! যদি তুমি দিনান্তে শুধু একবার করে তোমার ঐ পায়ের ধূলো স্পর্শ করতে দাও আমায়। সেই আমার যথেষ্ট। তা হ'লেই হাসিমুখে আমি সব কষ্ট বরণ করে

নিতে পারবো। শুধু এ অধিকারটুকু থেকে যেন তুমি আমায় কোন দিন বঞ্চিত করো না।" বলতে বলতে চামেলী নিজের মুখে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে অতিকষ্টে উদ্বেলিত অশ্রু সংযত করলো।

চৌদ্দ

"বলি রাণী, তুই কি আমায় শান্তিতে থাকতে দিবিনে মা ?"

"কেন ! আমি কি করেছি ?"

"কি—না করেছিস্, তাই বলনা ? রাত এখন ক'টা বাজে, সে খেয়াল আছে ? এমনি করে, এই মিট্‌মিটে প্রদীপের আলোতে বসে বসে রাতেও যদি এত পরিশ্রম করিস্, তাহ'লে কি তোর আর স্বাস্থ্য টিকবে ?"

"কিচ্ছু হবে না বাবা, তুমি ভেবনা।" বলে রাণী তার হাতের কাজটা ফেলে উঠে পড়ল শুধু জগুকে শান্ত করবার জন্যে।

রেগে ওঠে জগু। হাত মুখ নেড়ে বললে, "না কিচ্ছু হবে না ! তুই তো সবই জানিস্ ! দেখেছিস্, একবার আর্সিতে তোর চেহারাখানা ? কি ছিলি—আর কি হয়েছিস্ !" বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জগু ! তারপর শান্ত কণ্ঠে বললে, "দোষ দেব কাকে মা, দোষ তো আমারই ! আমি বাপ হয়ে পারিনে তোকে দু'মুঠো খাওয়াতে ! এর চাইতে দুঃখ কি আর আছে !" বলেই সজল নয়নে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে সে।

জগু চলে যাওয়ার পর পুণরায় সেলাইটা হাতে নিয়ে রাণীর কত কথাই না মনে পড়তে লাগল এক একটি করে। মনে পড়লো, মা-বাবার কথা, শৈশবেই সে যাঁদের হারিয়েছে। এই হারানো যে কত বড় অভিশাপ, তা আজ তার মতো মর্মে মর্মে আর কেউ কি বুঝেছে। এই হারানোর ফলেই সে হয়েছে—সহায় সম্বল-হীনা, ভিখারিনীরও অধম। তার জীবনে নেমে এসেছে লাঞ্ছনার অজস্র বর্ষণ ! মনে পড়ল তরুর মার কথা—যে এমনি এক অন্ধকার রাতে নিজের জীবন বিপন্ন করে, রক্ষা করেছিল তাকে বিপদ থেকে। মনে পড়ল প্রণব ও বীণার

কথা—চারুদির কথা—তাদের স্নেহ ও ভালবাসা। মনে পড়ল যমডোবার কথা। এক এক করে আরো মনে এল তার বিবাহের প্রথম দিনগুলো। তারপর আশীষের নির্দ্দয় ও কঠোর ব্যবহার। একে একে সব স্মৃতি মনে এসে ভীড় করতে লাগল তার। সেই সঙ্গে ভাবতে থাকে, সরল প্রাণ, মহৎ, পরহিতব্রত, দরদী ও অপত্য-বৎসল পিতৃতুল্য জগুর কথা। যার আশ্রয়-কোলে, মেয়ের সমস্ত অধিকার নিয়ে আধিপত্য করছে সে।

রাণীর চিন্তাধারাকে বাধা দিয়ে পুণরায় জগু ফিরে এলো ঘরে। বললে, "আচ্ছা রাণী বল্‌তো, কেন তুই দিলিনে আমায় হারাধন কর্ম্মকারের দোকানে কাজটা নিতে? আজ যদি কাজটি আমি নিতুম, তাহ'লে কি তোকে এমন হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করতে হতো? তোর খাটুনি যে আর আমি সইতে পারিনে মা! কেন তুই বাধা দিলি আমায়?"

"ও কাজ তোমার পক্ষে সম্ভব নয় বলেই বাধা দিয়েছি।"

"কেন সম্ভব নয় শুনি?"

"ও কাজ ভারী শক্ত কাজ। তার উপর—তুমি অসুস্থ, বয়েস হয়েছে। আমি বেঁচে থাকতে, কখনও তোমাকে ও কাজ করতে দিতে পারবো না।"

রেগে ওঠে জগু রাণীর কথাতে। বললে, "গরীবের আবার সুস্থ অসুস্থ, গরীবের আবার বয়েস! কালকেই যাবো আমি হারাধনের কাছে।"

জগুর কথাতে ভয়ে ও আতঙ্কে রাণীর বুকখানা কেঁপে উঠলো। সত্যিই কি এই বয়েসে যাবেন উনি হারাধনের কাছে কাজের জন্যে! লোহা পিটানোর কাজ—যে শক্ত কাজ। না এ কখনও হ'তে পারে না। কখনও তাকে একাজ করতে দেবোনা আমি।

নিমেষের মধ্যে মনে মনে এই কথাই ঠিক করে ফেল্‌লে সে।
"কি ভাবছিস্ মা? সত্যি বলছি—আমায় আর বাধা দিস্‌নে। কালকেও হারাধনের সাথে দেখা হয়েছিল।"
"তা হোক, আমি দেবোনা তোমাকে এ কাজ করতে।"
"দিবিনে তো—সংসার চলবে কি করে?"
"যিনি চালাবার তিনিই চালাবেন।"
রাণীর কথায় একটু হেসে, জগু বললে, "তোর সঙ্গে কথায় কোন দিনই এঁটে উঠবো না জানি। বলি—তুই কি সারা জীবন আমাকে এমনি করে খেটে খাওয়াবি? শুধু মালা গাঁথছিস্—গাঁথছিস্। কেন আবার এর উপর পাড়ার ছেলেমেয়েদের যত জামা সেলাইয়ের ঝামেলা ঘাড়ে নিলি?"
"কি হয়েছে তাতে?"
"শোন মেয়ের কথা! তোরতো কিছুতেই কিছু হয়না। যত কিছু হবে আমার?"
"সত্যি বিশ্বাস কর বাবা। এসব কাজ করতে আমার খুব ভালো লাগে!"
একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে জগু। বললে,—"তা না বলে, কি আর বলবি বল?"
উত্তরে একটু হাসে, রাণী। এগিয়ে এসে বললে জগুকে "বাবা রাত অনেক হয়েছে, এখন শোবে চল, এত রাত জাগা, ধাতে সইবে না তোমার।"
"হুঁ," বলে জগু আরো গাঁট হয়ে বসে। বেশ একটু রাগের সুরেই বললো, "আমি যাই ঘুমুতে—আর তুই সেই অবসরে নিশ্চিন্ত হয়ে, সারা রাত ধরে মালা গাঁথবি—এই তো?"
জগুর কথায় এবার বেশ জোরে হেসে উঠলো রাণী, বললে, "না,

তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, বাবা। আমি আর এখন সেলাইও করবোনা, মালাও গাঁথবো না। হ'লো তো? যাও এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে।"

'সত্যি বলছিস্ তো মা?"

"হ্যাঁ বাবা, সত্যি বলছি। চলো আমি এগিয়ে দিয়ে আসি। যা অন্ধকার। দাঁড়াও ঐখানাটায়। প্রদীপটা নিয়ে আসি।"

পনরো

সবে বিকেল। সংসারের কিছুটা কাজকর্ম্ম একমনে সমাধা করে, রোজকার মত ঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে বসে মালা গাঁথতে থাকে রাণী। তারই কিছুটা দূরে বসে খোকন তার পড়া তৈরী করছিল—

"বাবা যদি রামের মত পাঠায় আমায় বনে........."

"কি হ'লো রে খোকন ? —পড়তে পড়তে থেমে গেলি যে ?"

"মা !"

"কিরে—কি হ'লো ?"

পড়া ছেড়ে রাণীর গা ঘেঁষে দাঁড়ায় খোকন। রাণীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলে "আচ্ছা মা, আমার বাবা কে ? —কোথায় থাকে ?"

ছেলের এই আকস্মিক প্রশ্নে বিচলিত হয়ে পড়ে রাণী! এ প্রশ্ন যে একদিন সে তাকে করবে, তা সে জানতো। খোকন তো আর সেই ছোট্ট খোকনটি নেই। এখন সে বড় হয়েছে— বুঝতে শিখেছে। আজ তার বিগত দিনের ক্ষতগুলো যেন বেশী করে একসঙ্গে সব মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে। ছেলের প্রশ্নের কি জবাব দেবে সে আজ ? দিশে না পেয়ে শুধু তাকে ভুলিয়ে দেবার জন্যে বললো, "খোকন ওঘরে আরও চারটে ফুল আছে, নিয়ে আয়না, বাবা, আমার মাত্তায় বড্ড ব্যথা হয়েছে, উঠতে পাচ্ছি না।"

"যাচ্ছি, মা, আগে বলনা, আমার বাবা কোথায় ?"

"আঃ," কৃত্রিম ক্রোধের সুর ফুটে ওঠে রাণীর কণ্ঠস্বরে। "আগে যা

বলছি তাই কর না, দেখছিস না, আরও ফুলের দরকার? আর হ্যাঁরে খোকন, নবু যে এখনো তোকে ডাকতে এলো না, সে না এলে বুঝি তোর আর বেড়াতে যেতে ইচ্ছা করে না?"

হায় রে পোড়াকপাল! রাণী কথাটা পাড়লো তার ছেলেকে ভোলাবার জন্যে কিন্তু এতে আরও ছেলের প্রশ্নের আগুনেই যে ইন্ধন যোগাবে তা সে কী করে বুঝবে?

"না, রে, নবু আর আসবে কেন? আজকাল তার বাবা যে রোজ তাকে বেড়াতে নিয়ে যায়। আর জানো মা, ওর বাবা রোজ বিস্কুট আর লজেন্স, কোনদিন বা বিস্কুট আর চকোলেট কিনে দেয়। আর কাল একটা ঘুড়ি কিনে দিয়েছে, কী সুন্দর দেখতে। আমার বাবা কবে আসবে, বলনা, মা!"

খোকন এতক্ষণ গল্পেই মেতে ছিল। লক্ষ্য করেনি যে তার মা, হাতের মালা ফেলে রেখে কাত হয়ে জানলায় মাথা রেখে নিঃশব্দে কাঁদছে। খোকন কাছে যেতেই তার মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে নিলো। "এ, তোমার মাজার ব্যথা বেড়েছে বুঝি, আচ্ছা, তুমি এখানে উপুড় হয়ে শোও, আমি তোমার মাজার উপর উঠে বসছি"—বলে খোকন মাকে শোওয়াবার চেষ্টা করলো।

"না বাবা, তোমার কিছু ক'রতে হবে না।" এমন হাসিমুখে বললো রাণী কথাটা যে খোকন মায়ের সেবার বদলে নিজেই গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো মায়ের কোলে। তার কি মনে হ'লো, কে জানে? হয়তো ভাবলো মাকে প্রশ্নটা করা তার খুবই অন্যায় হয়েছে। তাই রাণীর মুখের উপর মুখ রেখে বললে, "আমি আর কখনও বাবার কথা জিজ্ঞেস করবো না মা!"

রাণী আর কোন কথা বলতে পারলো না। খোকনকে কোলে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খোকনের পড়ার কথাগুলো

বার বার করে মনে পড়তে লাগলো তার, "বাবা যদি রামের মত পাঠায় আমায় বনে............।" বনেই তো পাঠিয়েছেন তার বাবা; তার ছেলেকে। তাঁর পরিচয় কি দেবে সে আজ, খোকনের কাছে? ঠিক এমন সময় জগু এসে, 'দাদু' বলে ডাক দিয়ে, খোকনকে সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে গেল।

প্রায়ই খোকন দাদুর সঙ্গে বেড়াতে যায় বিকেলে। পথের মধ্যে কত কথাই না হয় দাদু আর নাতিতে। শিশু-সুলভ কত প্রশ্নই না করে খোকন। দাদু জবাব দেয়। দাদু প্রশ্ন করে খোকনকে—খোকন উত্তর দেয়। খোকনও হাসে, দাদুও হাসে। এইভাবে প্রায় দিনই বিকেলটা তাদের আনন্দে কেটে যায়। কিন্তু আজ খোকন একেবারে নীরব। তার মনে রোজকার মত সে প্রফুল্লতা নেই। অধরে মধুর সেই হাসিটি নেই। বোধহয় কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে ঘটনাটি ঘটে গেল, সেই ঘটনাটি তার শিশুমনকে তোলপাড় করছিল। খোকনের এই ভাব দেখে জিজ্ঞেস করলে জগু, "হ্যাঁরে দাদু, তোর আজকে কি হলো? —কোন কথাই যে বলছিস্ নে?"

তবুও উত্তর পায়না জগু। শেষে ব্যস্ত হয়ে শুধালো, "তোর কি শরীর খারাপ হয়েছে দাদু?"

উত্তরে খোকন ঘাড় নেড়ে জানায়, "না!" পরক্ষনেই হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে খোকন, "আচ্ছা দাদু, আমার বাবা কোথায় থাকে? নবুরা আমায় জিজ্ঞেস করে বাবার কথা। আমি কিছু বলতে পারিনে। ওরা বলে বোকাটা, কিছু জানে না। মাকে শুধালে মা খালি কাঁদে।"

হঠাৎ খোকনের প্রশ্নে জগুও যেন কেমন হয়ে গেল। সহসা সে ঠিক করে উঠতে পারে না কি উত্তর দেবে তাকে—কি বলবে তার বাবার পরিচয়! এর চাইতে তার বাবা মরে গেলেও যে ছিল

ভালো! তাহলে তো আজ তার এত ভাববার কিছু ছিল না! এক কথায় বলতে পারতো, "ওরে দাদু, তোর বাবা নেই—ভগবান নিয়ে গেছে!" তাই কি বলবে তাকে ? না, না, এত বড় মিথ্যে কথা কি করে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবে সে ?

"বলো না দাদু, চুপ করে রইলে কেন ?" অধৈর্য হয়ে উঠে খোকন। খোকনের করুণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল জগু—"তোরও বাবা আছে রে।"

"আছে ?" আনন্দে তার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে!

"হ্যাঁ দাদু।"

"কোথায় দাদু ?" নেচে ওঠে খোকন !

"সে, অ—নে—ক—দূরে।"

"অ—নে--ক—দূরে ? —আমাদের নিয়ে যাবে না ?"

"হ্যাঁ, নিয়ে যাবে বৈকি দাদু। তুমি আরও একটু বড় হও। তখন নিয়ে যাবে।" দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে আবার প্রশ্ন করে খোকন; "মাকে, তোমাকে—নিয়ে যাবেনা ?"

"হ্যাঁরে—হ্যাঁ,—আমাদের সবাইকে নিয়ে যাবে।"

খোকনের আর আনন্দ ধরে না। যেমন বিমর্ষ হয়ে আজ গিয়েছিল দাদুর সঙ্গে বেড়াতে, তেমনি দাদুর একটি কথাতে মনে আনন্দ ও উৎসাহ নিয়ে ছুটে যায় রাণীর কাছে। দুহাত দিয়ে রাণীর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "মা, মা! দাদু বলেছে, আমারও বাবা আছে! কোথায়, জানো মা ? অ—নে—ক—দূরে। আমি যখন বড় হবো, তখন বাবা আমাদের সবাইকে নিয়ে যাবে। কি মজাইনা হবে! না—মা ?"

শুষ্ক মুখে তাকায় রাণী ছেলের মুখের দিকে। সে তাকানো যেমন বেদনাময় তেমনি নিরাশার।

মা'র মুখের ভাব দেখে ভয় পেয়ে যায় খোকন। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "তুমি কেঁদ না মা, কেঁদ না। আমি তোমাকে বাবার কথা আর জিজ্ঞেস করবো না।"

খোকনের কথায় রাণীর ওষ্ঠ প্রান্তে ম্লান হাসির রেখা দেখা দিলো। খোকনকে খুশী রাখবার জন্যে তার গালদুটি নেড়ে দিয়ে বললে, "দাদু ঠিক কথাই বলেছেন তোকে—তোরও বাবা আছেন।" মার কথা শুনে, আনন্দের আতিশয্যে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল খোকন। বোধ হয়, এই সংবাদটি তার খেলার সাথী নবুদের বলবার জন্যে।

ষোল

নবদ্বীপে রাধাকৃষ্ণের আজ ঝুলন-যাত্রা। সেই উপলক্ষ্যে মন্দিরের সামনে একটি মেলা বসেছে। জনতার অসম্ভব ভীড়। চারিদিকে কোলাহল, ছুটোছুটি, হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি। দোকানে, দোকানে দর কষাকষি চ'লছে। অদূরে পথচারীদের মধ্যে মাঝে মাঝে বৈষ্ণবেরা দলে দলে খোল-করতাল বাজাতে বাজাতে ঘুরে ঘুরে নাম গেয়ে চলেছে। এই মেলার এক ধারে জগুও একঝুড়ি কাগজের মালা নিয়ে বসে আছে, বিক্রির আশায়। বিক্রিও হয়ে গেল সবগুলো ফুলের মালা ঘণ্টা কয়েকের ভেতর। আনন্দে প্রাণ নেচে ওঠে জগুর! চোখ দিয়ে ঝরতে থাকে তার আনন্দাশ্রু! সেই সঙ্গে মনে হতে থাকে রাণীরই কথা। আ—হা, কত কষ্টইনা করছে রাণী! রাত্রি দিন কি পরিশ্রমটা না করছে সে! তার পরিশ্রম যে এত শীগ্‌গির সার্থক হবে সে তা ভাবতেই পারেনি। টাকাগুলো হাতে পেয়ে মনে পড়লো খোকনের কথা। কিছু কিনতে হবে তার জন্যে। আসতে চেয়েছিল খোকন তার সাথে। এত দূরের পথ বলে আনেনি তাকে। কথা দিয়েছে তার জন্যে খেলনা কিনে আনবে। ভাবতেই মেলার ভেতর ঢুকে পড়ল সে। একটা কাঠের ঘোড়া হাতে তুলে দাম শুধালে দোকানীকে। দোকানী যা দাম বললে, জগুর সে দাম শুনে মাথা ঘুরে যায়। "এতো দাম?" ঘোড়াটা নেড়ে-চেড়ে ভাবতে থাকে জগু—"কিনে ফেলি। দাদুর আমার অনেক দিনের সখ। হলোই বা এক টাকা। মালা বিক্রি করে সাতটি টাকা পেয়েছে আজ। রোজ তো এর সিকিও পায়না। কোন দিনই তো খোকনের জন্যে কিছুই নিতে পারেনা সে। আর আজ এতগুলো টাকা

পেয়ে খালি হাতে বাড়ী ফিরে যাবে ? না—তা হয় না। কিন্তু রাণী যদি বকাবকি করে—যদি রাগ করে ! করেতো, করবে। দাদুর আমার আর কেই বা আছে, আমি ছাড়া ?" ভাবতেই পকেট থেকে এক টাকার একটা নোট বের করে দেয় দোকানীর হাতে। তারপর ঘোড়াটি হাতে নিয়ে হাঁটা দেয় সোজা বাড়ীর দিকে।

তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে। খানিকটা দূর এগুতেই শুনতে পেল কে যেন তাকে পেছন থেকে ডাক্‌ছে। অপরিচিত গলার স্বর শুনে, পেছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল একটি যুবককে। জগু ফুলের ঝুড়ি ও কাঠের ঘোড়টা, ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিয়ে যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললে, "আমায় কিছু বলছো বাবা ?"

"হ্যাঁ।"

"কি বলো ?"

"দেখুন, এখানে আমি নতুন এসেছি। এখানকার রাস্তা ঘাটের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই। সারাটা দিন ঘোরাঘুরি করে বড্ড হয়রাণ হয়ে পড়েছি। ক্ষিধেও পেয়েছে খুব। সন্ধ্যোও হয়ে এলো। কি করি—বলুন তো ?"

জগু যুবকটিকে ভাল করে নিরীক্ষণ করে বললে, "তুমি কোথা থেকে এসেছো বাবা ?"

"কলকাতা থেকে।"

"আচ্ছা, এখানে কোন হোটেল টোটেল আছে ?"

"তা আছে বৈকি"।

"কোথায় ?

"আমারই বাড়ী থেকে কিছুটা দূরে, একটা ভালো হোটেল আছে।"

"আমায় একটু বলে দেবেন হোটেলে যাওয়ার পথটা ?"

"কিন্তু তোমায় তো বড়ো ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে বাবা।" বলে জগু

পুনরায় নিরক্ষীণ করে যুবকটিকে। তারপর একটু ভেবে বললে, "তা এক কাজ করোনা ? চলনা আমার বাড়ী। ঐতো আমার বাড়ীর আলো দেখা যাচ্ছে। আমার বাড়ীতে যা হয় একটু কিছু মুখে দিয়ে পরে হোটেলে যেও।"

কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে বললে যুবকটি, "মাপ করবেন। এমন অসময়ে—আমি আপনাদের অসুবিধে করতে পারবোনা।"

ডান হাতখানা নেড়ে বললে জগু, "কিছু অসুবিধে হ'বেনা —কিছু অসুবিধে হবে না ! রাণীমা আমার, সব ঠিক করে দেবে।"

"রাণী ?" চমকে উঠলো যুবকটি।

তার সেই ভাব লক্ষ্য করলে জগু।

আশীষ পুণরায় জগুকে জিজ্ঞাসা করলে, "তারপর কি যেন বলছিলেন আপনি ?"

"রাণীর কথাই বলছিলাম বাবা। বড় দুঃখী ও। ওর দুঃখের কথা শুনলে পাষাণ হৃদয়ও গলে যায়। হতভাগা স্বামী এমন লক্ষ্মী প্রতিমাকে চিন্‌লেনা। বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে আমার লক্ষ্মী মাকে।"

অন্তরের উত্তাল তরঙ্গ চেপে আশীষ জিজ্ঞাসা করলে, "কেন তাড়ালে তার স্বামী ?"

"সে অনেক কথা বাবা, অনেক কথা। আমিও বলে রেখেছি আমার মেয়েকে, যে-স্বামী তোকে বিনা কারণে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে, সে একদিন তার ভুল বুঝতে পেরে তোকে সেধে নিয়ে যাবে। কোলে অমন রাজ-পুত্তুরের মত ছেলে, তার দিকেও হতভাগা একবারটি চাইলে না।"

উৎসুক হয়ে আবার জিজ্ঞেস করলে আশীষ, "ছেলেটি কত বড় ?"

"এইতো বছর পাঁচেক। সেই তো আমার খেলার সাথী। ভারী

চালাক ছেলে। বড় হ'লে মানুষের মত মানুষ হবে।"

"কি নাম আপনার নাতির ?"

"ডাকি ওকে 'খোকন' বলে।"

"খোকন!" পুণরায় চম্‌কে ওঠে আশীষ। তবে কি এই তার সেই খোকন আর রাণী ? যাদের সে একদিন বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল বিনা দোষে। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে কত জায়গায় না খোঁজ করেছে সে তাদের। একি তার সেই রাণী ? কিন্তু, —রাণীর তো কোন আত্মীয় ছিল না !

পথে চলতে চলতে অচেনা, অজানা, এই লোকটির অমায়িক ব্যবহারে—তার প্রাণ খুলে কথা বলার ধরণে, সত্যই জগুর প্রতি আশীষের সমস্ত হৃদয়খানা শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। তাই জগুর বারংবার সানুনয় অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে না পেরে, অগত্যা তার বাড়ী যেতে রাজি হোল সে।

"এই যে আমরা এসে গেছি বাবা। গরীব মানুষ, এই দুখানা কুঁড়ে ঘরে আমার রাণীমা আর দাদুকে নিয়ে কোনমতে মাথা গুজে থাকি। রাণী আমায় কাগজের মালা গেঁথে দেয়। তাই বিক্রি করে কষ্টে-স্বষ্টে দিন চলে আমাদের। মালা বিক্রি ছাড়া আর কোন কাজ করতে দেয়না রাণী। বলে, বুড়ো হয়েছে, বয়েস হয়েছে!" চোখের কোণ সজল হয়ে ওঠে জগুর।

আশীষ আবিষ্ট হ'য়ে জগুর কথা শোনে। অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে জগুরই মুখের পানে। দ্বিগুণ উৎসাহিত হ'য়ে আবার জিজ্ঞেস করলো, "কী বললেন—মালা গাঁথে আপনার মেয়ে ?"

"হ্যাঁ বাবা।"

জগুর মুখে তাদের কথা শুনে আশীষের মন বিস্ময়ে পূর্ণ হয়ে উঠল। ভাবতে থাকে আশীষ রাণীরই কথা। বিয়ের পর যখন সে

ছিল বেকার, রাণী বায়না ধরেছিল কাগজের মালা তৈরী করে সংসার চালাবে। তখন রাজী হয়নি সে রাণীর কথায়। সেদিন রাজী হ'লে হয়তো সে আজ রাণীকে হারাতো না। হয়তো বা এমন নরক যন্ত্রণা ভোগ করতেও হ'তো না। একথা মনে হতেই সে ধিক্কার দিতে থাকে নিজেকে। পরমুহূর্তেই ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে এদের সত্যি পরিচয় জানবার জন্যে।

"ওকি ভাবছো বাবা; বাড়ীর সামনে এসে? আমি কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছি তোমায়।"

"না, না, ও কিছু নয়।" বলেই আশীষ অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ল। আশীষকে বাইরের ঘরে বসিয়ে জগু বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে ডাকতে থাকে, "রাণী কোথায় গেলিরে, ওরে, আমাদের বাড়ীতে একজন অতিথি এসেছেন।"

রাণী ছিল রান্নাঘরে। উনুনের কাঠ ভালো করে গুঁজে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলে, "কে বাবা?"

"নতুন এসেছেন কলকাতা থেকে। রাস্তাঘাট জানা চেনা নেই ভদ্রলোকের। বড় ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত দেখে, এখানে একটু জলখাবার খেয়ে বিশ্রাম করে যেতে বলেছি। ঘরে যে খাবার আছে অতিথিকে দে মা। আর নে, এই খেলনাটা, দাদুকে দিস্।

রাণী খেলনাটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে বললে, "আবার এটা কেন এনেছ? শুধু শুধু পয়সা খরচ।"

"তা হোক, তুই রাগ করিস্‌নে। একটা সামান্য খেলনাই তো। দেখবি, এই খেলনাটা পেয়ে খোকন কত খুশী হয়। তোর সব মালাই বিক্রি করেছি। এই নে টাকা ক'টা। রেখে দে। রান্না হ'য়ে গেছে মা?"

"বা রে, তুমি যেন আজকাল কেমন হয়ে গেছ বাবা! কিছু মনে

থাকে না তোমার। ঘরে চাল বাড়ন্ত। তুমি যে বলে গেলে মেলা থেকে ফেরবার পথে চাল নিয়ে আসবে?"

"ওঃ যা—আমি যে একেবারেই ভুলে গেছি। দে, মা, দে থলেটা, চট করে চালটা নিয়ে আসি। আর ঐ সঙ্গে একটা টাকাও দে।"

জগু টাকা ও থলে হাতে নিয়ে, আশীষ যে ঘরে বসা ছিল সেই ঘরে ঢুকে তাকে বললে, "তুমি একটু বিশ্রাম কর বাবা— আমি এলাম বলে।"

জগু চলে গেলে, রাণী চারটে নারকেলের নাড়ু, দুটো মুড়ীর মোয়া, দু'খানা রুটি ও একটু তরকারি একখানা পেতলের রেকাবে সাজিয়ে ডাকলে খোকনকে। রেকাবখানা ও এক গ্লাস জল খোকনের হাতে তুলে দিয়ে বললে, "বাইরের ঘরে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। এই জল-খাবারটা তাঁকে দিয়ে এসো। দাদু ফিরে না আসা পর্য্যন্ত চলে এসো না যেন।"

একহাতে জলের গ্লাস ও আরেক হাতে খাবারের রেকাবখানা তুলে নিয়ে খোকন জিজ্ঞাসা করলো, "ভদ্রলোক, কে মা?"

"চিনিনে, বাবা। তোমার দাদুর সঙ্গে এসেছেন। দাদু গেছেন চাল আনতে। যাও তুমি।"

"আচ্ছা," বলে খোকন বাইরের ঘরের দিকে পা বাড়াতেই চোখে পড়ল তাকের উপর মস্ত কাঠের ঘোড়াটা। আনন্দে থমকে দাঁড়াল খোকন সেইখানে। বলল, "এ ঘোড়াটা কার মা?"

"তোমার দাদু মেলা থেকে তোমার জন্যে কিনে এনেছেন।"

"কী সুন্দর ঘোড়াটা, না—মা?"

"হ্যাঁ, খুব সুন্দর। তুমি এখন যাও তো খোকন খাবার নিয়ে।"

"যাচ্ছি মা।"

রেকাবখানার ভারে খোকনের কচি হাতখানা বেশ কাঁপছিল। পা টিপে টিপে আশীষের ঘরে প্রবেশ করে, রেকাবখানা ও জলের

গ্লাসটা আশীষের সামনে আস্তে আস্তে নামিয়ে রেখে বললে, "আপনি খেয়ে নিন—মা পাঠিয়ে দিয়েছেন।" বলেই একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

"ওরে বাবা! —কত খাবার এনেছো? —আমি তো খাবো তোমাকেও কিছু ভাগ নিতে হবে।"

"না, আমি খাবো না।"

"কেন?"

"আমি এইমাত্র খেয়ে এসেছি। আপনি খান।"

লজ্জিত খোকনের কচি হাতখানা জোর করে টেনে ধরে আশীষ বললো, "তা হোক," বলে তার দুই হাতে দুটো নাড়ু দিয়ে তাকে নিজের পাশে নিয়ে বসালো। তারপর ক্ষুধার্ত আশীষ রেকাব থেকে খাবারগুলো একটির পর একটি করে খেতে খেতে প্রশ্ন করলে, "তোমার নাম কী খোকা?"

"আমার নাম খোকা নয়—খোকন। মা আমাকে ডাকেন খোকন বলেই। আর দাদু আমায় কখনও দাদু, কখনও খোকন বলেন।"

"তুমি কী পড় খোকন?"

"অনেক বই পড়ি। বাংলা, ইংরাজী, ছড়ার বই ও আরো অনেক। ছড়া বলতে আমার খুব ভাল লাগে। রোজ রোজ দাদু আমায় ছড়া শিখিয়ে দেন। বলবো একটা? —শুনবে তুমি?" বলেই আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে আশীষকে একবার তুমি, একবার আপনি বলে সম্বোধন করতে থাকে। হেসে বললে আশীষ, "বেশ তো বলোনা একটা ছড়া, শুনি।"

"মা যেটা শিখিয়েছেন সেইটে বলবো?"

"আচ্ছা, বলো।"

খোকন ছড়া বলতে থাকে—

"খোকার আছে তিনটী সাথী
একটী ঘোড়া একটী হাতী।
একটী আর ঐ কুকুর ছানা
দুধমাখা ভাত তার যে খানা।
খোকা এখন কি কাজ করে?
হাতী ঘোড়ার পিঠে চড়ে।"

"বাঃ, ভারী চমৎকার ছড়া শিখেছ তো তুমি।"

"জানো, আমার দাদু খুব ভাল। আমাকে খুব ভালবাসেন। আজকে মেলা থেকে মস্ত বড়ো একটা ঘোড়া কিনে এনেছে। দেখবে? —আনবো?" বলেই খোকন আশীষকে উত্তর দেবার অবসর না দিয়েই, ছুটে ঘর থেকে ঘোড়াটা নিয়ে এসে আশীষকে দেখালো।

"বাঃ, খুব সুন্দর ঘোড়াটা তো। আমাকে তোমার ঘোড়ায় চড়াবে?"

"বাঃ, বড়রা বুঝি কাঠের ঘোড়ায় চড়ে?"

"তুমি চড়বে না?"

"আমি তো এখন ছোট। যখন তোমার মতো বড় হ'ব তখন আর চড়বো না।"

হেসে উঠল আশীষ খোকনের জবাব শুনে, মুগ্ধ হোল তার কথা বলার ভঙ্গি দেখে। তার রাঙা গালদুটো আদর করে একটু টিপে দিয়ে বললে, "খোকন, তুমি ভারী চালাক ছেলে।" এই ফুট্‌ফুটে ছেলেটী আশীষের মনে হলো যেন 'মাটীর ঘরে চাঁদের কোণা'। আশীষ ফ্যাল্-ফেলিয়ে তাকিয়ে থাকে তারই মুখের দিকে। ভাবতে থাকে তারই খোকনের কথা। খোকন যদি বেঁচে থাকে, তাহলে তো এত বড়টিই হয়েছে। হয়তো বা এমনিভাবে সেও কথা বলতে শিখেছে।

যখন এইভাবে খোকন ও আশীষের মধ্যে কথা-বার্তা, হাসি-কৌতুক

চলছিল, ঠিক সেই সময় জগু এলো ফিরে চাল নিয়ে। আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিল এদের কথা। হাসতে হাসতে সে ঢুকলো ঘরে। বললে, "দাদু দেখছি এর মধ্যে তোমার সঙ্গে খুব ভাব করে ফেলেছে।"

"শুধু ভাবই করেনি—কত আদর যত্ন করেই না আমায় খাওয়ালে।" নাতির প্রশংসায় জগুর বুকখানা গর্বে ফুলে উঠল। বললে, "হু, তাই তো বলি বাবা, এমন ছেলেকে হতভাগা বাপ চিনলেনা। সে যাক্, তা হ'লে চলো বাবা, আমি তোমায় হোটেলে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।"

"চলুন" বলে, সবে মাত্র আশীষ দরজার বাইরে পা দিয়েছে যাবার জন্যে, খোকন সেইখানেই দাঁড়িয়েছিল ঘোড়াটা হাতে করে। হঠাৎ আশীষকে প্রশ্ন করলো, "চলে যাচ্ছ বুঝি?"

"হ্যাঁ খোকন।"

"কোথায়? —বাড়ীতে?"

"না, হোটেলে।"

"আচ্ছা, তোমার বাড়ী কোথায়?"

"কলকাতায়।"

"সে বুঝি অনেক দূরে?"

"হ্যাঁ, অনেক দূরে।"

"ও, অ—নে—ক—দূ—রে!"

খোকনের কথা সঠিক বুঝতে পারল না আশীষ। খোকনের দিকে তাই তাকাতেই খোকন বলে উঠলো, "জানো, আমার বাবাও থাকে অ—নে—ক,—অনেক দূরে! দাদু বলেছে, যখন আমি বড় হ'বো তখন আমাকে, মাকে নিয়ে যাবে বাবার কাছে! আমি বাবাকে একদিনও দেখিনি!" বলেই মুখখানা কাচুমাচু করে তাকায়

আশীষের দিকে।

বুকের মধ্যে যেন একবার টন্‌টন্‌ ক'রে উঠলো আশীষের। মনে হতে লাগলো এদের এই কুঁড়ে ঘর দুটো যেন অসীম রহস্যে ভরা। বুঝি এই রহস্য ভেদ করতে পারলেই তারও জীবনের গ্রন্থিগুলো মুক্তিলাভ করে। সে যে আর পারে না এই গুরুভার অন্তর্দ্বন্দ্বের বোঝা বয়ে বয়ে। কিন্তু এখনও তো সমস্তই অজানা, সমস্তই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে ডোবানো। আলোর আশায় হাত বাড়িয়ে যদি সে আলো না পায়?

এই কচি ছেলেটির করুণ মুখখানা তাকে যেন এখনই হাত বাড়িয়ে দিতে বল্‌ছে, কিন্তু, যদি—যদি হাত বাড়িয়ে আবার তাকে হাত গুটিয়ে নিতে হয়!

খানিক মৌন থেকে বললে আশীষ, "তাহ'লে আমি এখন আসি খোকন?"

একান্ত আপন জনকে বিদেশে ছেড়ে দিতে মন যেমন কেঁদে ওঠে খোকন ঠিক সেইভাবেই শুধালে আশীষকে, "আবার কবে আসবে?" সত্যিই খোকনের সঙ্গে এতটা সময় মেলামেশা ও গল্প-গুজব করে আশীষেরও বেশ মায়া বসে গিয়েছিল খোকনের উপর। তার প্রশ্ন শুনে সে কী বলবে বুঝে উঠতে না পেরে, তাকাল জগুর মুখের দিকে। আশীষের মনের ভাব বুঝতে পেরে, বলে ওঠে জগু, "আসবে বই কী বাবা। আমার দাদুর যখন সাধ হয়েছে তখন তোমাকে আসতেই হ'বে কাল। আর খাবেও এইখানে। কী বলো খোকন, তাই না?"

"হ্যাঁ," বলে মাথা ঝেঁকে সম্মতি জানায় খোকন।

আশীষকে হোটেলে পৌঁছিয়ে দিয়ে, পুনরায় খোকনের কথাটা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে, আশীষের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরে এলো জগু।

সতরো

খোকনের নিমন্ত্রণ রাখতে ঠিক সময়ে হাজির হ'লো আশীষ। আশীষকে দেখতে পেয়ে আনন্দে ছুটে গেল খোকন তার কাছে। তার হাত দু'খানা ধরে তাকে বসালো নিয়ে ঘরে। জগু ছিলনা বাড়ীতে। হঠাৎ কী একটা জরুরী কাজে কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে রাণী খোকনকে দিয়ে আশীষের খাবার পাঠিয়ে দিলো। খাবারগুলোর দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে জিজ্ঞেস করলে আশীষ—

"তোমার দাদু কোথায়, খোকন?"

"দাদু? —বাইরে চলে গেছেন।"

"কখন ফিরবেন?"

"বলে গেছেন ফিরতে অনেক রাত হবে। তুমি খেয়ে নাও।"

পুনরায় খাবারগুলো দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলল, "এত খাবার এনেছ কেন?" "মা দিলেন। সব খেতে হ'বে কিন্তু—কিছু ফেলতে পারবেন না।"

খোকনের কথায় মৃদু হেসে উঠলো আশীষ। খাবারগুলো খেতে খেতে পুনরায় প্রশ্ন করল তাকে।

"খোকন, বিকেলে তুমি কী করো?"

"খেলা করি। আবার দাদুর সঙ্গে বেড়াতেও যাই।"

"খেলা কর—কার সাথে? তোমার বুঝি অনেক বন্ধু আছে?"

"হ্যাঁ—অ—নে—ক। নবু, হরি, যদু, সোণা, ভূতো। জানো, ভূতোটা ভারী ঝগড়াটে।"

"তোমাদের সাথে ঝগড়া করে বুঝি?" হেসে জিজ্ঞেস করল আশীষ।

"হুঁ," কতবার।

"আর কী করে?"

"আমরা যে মাঠে খেলা করি তার পাশে রাস্তার ধারে একটা বড় পেয়ারা গাছ আছে। ভুতো রোজ রোজ পেয়ারা পেড়ে এনে আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে খাবে। আমাদের কাউকে দেবে, আবার কাউকে দেবে না।"

হো—হো করে হেসে উঠল আশীষ খোকনের কথা শুনে।

"তোমাকে দেয়?"

"উঁহু।"

"নাই বা দিলো, তুমি পাড়তে পারো না?"

"না, যা উঁচু গাছ। জানো—ভুতো পেয়ারাগুলো অর্দ্ধেক খেয়ে খেয়ে আমাদের গায়ে ছুঁড়ে মারে।"

"তাই নাকি? —তাহলে ওকে তোমরা ভয়ও কর দেখছি।"

"হুঁ ভীষণ। ভুতোকে সবাই ভীষণ ভয় করে।"

খোকনের কথায় অন্যমনস্ক আশীষ সহসা হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, "তা'হলে এবার আমি উঠি খোকন। দাদুকে বলো আমি কালকে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করবো।"

সতরো

খোকনের নিমন্ত্রণ রাখতে ঠিক সময়ে হাজির হ'লো আশীষ। আশীষকে দেখতে পেয়ে আনন্দে ছুটে গেল খোকন তার কাছে। তার হাত দু'খানা ধরে তাকে বসালো নিয়ে ঘরে। জগু ছিলনা বাড়ীতে। হঠাৎ কী একটা জরুরী কাজে কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে রাণী খোকনকে দিয়ে আশীষের খাবার পাঠিয়ে দিলো। খাবারগুলোর দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে জিজ্ঞেস করলে আশীষ—

"তোমার দাদু কোথায়, খোকন ?"

"দাদু ? —বাইরে চলে গেছেন।"

"কখন ফিরবেন ?"

"বলে গেছেন ফিরতে অনেক রাত হবে। তুমি খেয়ে নাও।"

পুনরায় খাবারগুলে দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলল, "এত খাবার এনেছ কেন ?" "মা দিলেন। সব খেতে হ'বে কিন্তু—কিছু ফেলতে পারবেন না।"

খোকনের কথায় মৃদু হেসে উঠলো আশীষ। খাবারগুলো খেতে খেতে পুনরায় প্রশ্ন করল তাকে।

"খোকন, বিকেলে তুমি কী করো ?"

"খেলা করি। আবার দাদুর সঙ্গে বেড়াতেও যাই।"

"খেলা কর—কার সাথে ? তোমার বুঝি অনেক বন্ধু আছে ?"

"হ্যাঁ—অ—নে—ক। নবু, হরি, যদু, সোণা, ভূতো। জানো, ভূতোটা ভারী ঝগড়াটে।"

"তোমাদের সাথে ঝগড়া করে বুঝি ?" হেসে জিজ্ঞেস করল আশীষ।

"হুঁ," কতবার।

"আর কী করে ?"

"আমরা যে মাঠে খেলা করি তার পাশে রাস্তার ধারে একটা বড় পেয়ারা গাছ আছে। ভুতো রোজ রোজ পেয়ারা পেড়ে এনে আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে খাবে। আমাদের কাউকে দেবে, আবার কাউকে দেবে না।"

হো—হো করে হেসে উঠল আশীষ খোকনের কথা শুনে।

"তোমাকে দেয় ?"

"উঁহু।"

"নাই বা দিলো, তুমি পাড়তে পারো না ?"

"না, যা উঁচু গাছ। জানো—ভুতো পেয়ারাগুলো অর্দ্ধেক খেয়ে খেয়ে আমাদের গায়ে ছুঁড়ে মারে।"

"তাই নাকি ? —তাহলে ওকে তোমরা ভয়ও কর দেখছি।"

"হুঁ ভীষণ। ভুতোকে সবাই ভীষণ ভয় করে।"

খোকনের কথায় অন্যমনস্ক আশীষ সহসা হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, "তা'হলে এবার আমি উঠি খোকন। দাদুকে বলো আমি কালকে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করবো।"

আঠারো

আশীষ ও চামেলী একই সঙ্গে বাস করে সেই বাসাতেই। পূর্ব্ব-পরিচিতা প্রতিবেশী হিসাবে চারুদি তখনও এই বাসাতেই বাস করছিলেন। প্রথমে চাওয়া-চাওয়ি, তারপর দুটো একটা কথা হ'তে হ'তে চামেলীর সঙ্গে কিছুদিনের ভেতর চারুদির বেশ ভাব হ'য়ে গেল। তখন, কারণে অকারণে উভয়ে উভয়ের কাছে যেমন ঘন ঘন যাওয়া আসা করতো, আবার আপদে বিপদে উভয়ে উভয়েরই ছিল পরম বন্ধু।

প্রায় বছর পাঁচেক হ'তে চলেছে, এর মধ্যে চামেলীর একটি ছেলেও হয়েছে। ছেলেটী জন্মাবার পর থেকে চামেলী কি একটা কঠিন বুকের ব্যথায় কষ্ট পেতে থাকে। ইদানীং সেই ব্যথাটা বেশ কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে ও তার সঙ্গে নানা উপসর্গ মিলে চামেলীকে একেবারে কাহিল করে ফেলেছে।

চামেলী না জেনে, জীবনে যে ভুল করেছে, বোধ হয় সে মনঃকষ্টই এ রোগের সূত্রপাত। ডাক্তারের পরামর্শে আশীষ চামেলীকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল 'চেঞ্জে'। কিন্তু চামেলী রাজী হয়নি তাতে। সে প্রতিজ্ঞা করেছিলো, রাণীকে এ বাসায় যে পর্য্যন্ত আশীষ ফিরিয়ে আনতে না পারবে, ততদিন সে এ বাসা ছেড়ে কোথাও নড়বে না। কাজেই চারুদির তত্ত্বাবধানে রুগ্না চামেলী ও ছেলে বাবুলকে রেখে রাণীর সন্ধানে আশীষ নবদ্বীপে চলে যায়।

উনিশ

"উঃ, চারুদি!" এই বলে রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে পাশ ফিরলো চামেলী।

"কিরে বোন—ভাল লাগছে না বুঝি?"

মুখ বিকৃতি করে চামেলী। "ভাল, না—একটুও ভাল লাগছেনা"!

মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে চারুদি,—"তুই একটু ঘুমতে চেষ্টা কর্‌তো চামেলী—তাহলে দেখ্‌বি সব সেরে গেছে।"

"না, আমায় আর ঘুমতে বলোনা চারুদি! ঘুমলে—আমি আর জাগবো না!" রোগ-পাণ্ডুর মুখে উত্তর করলে চামেলী।

"চারুদি! উনি কেন এখনও ফিরছেন না?" —বলে ব্যাকুল হ'য়ে তাকায় চারুদির মুখের পানে।

"তুই এত ভাবছিস কেন—এখনও তো আসবার সময় যায়নি?" সান্ত্বনা দিয়ে বললে চারুদি।

"চারুদি, দিদির কথা বলবে আমায়—আমি শুনবো।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নড়ে-চড়ে বসে চারুদি। "কি আর বলবো বোন—সবই তো তোকে ব'লেছি।"

খানিকক্ষণ মৌন থাকে চামেলী। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করে, "আচ্ছা চারুদি, দিদি যদি ফিরে আসেন, আমায় ক্ষমা করবেন না?"

"আরার এসব কথা কেন চামেলী?" ব্যথিত চিত্তে উত্তর করলে চারুদি।

একটা করুণ দীর্ঘশ্বাস চামেলীর বুক চিরে বেরিয়ে যায়। বললে, "আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। তাই বলছি, যদি কোন দিন দিদি ফিরে আসেন, তুমি আমার হয়ে তাঁকে সব কথা

খুলে বলো। চারুদি সত্যি, আমি জানতাম না যে……।" আর বলতে পারলো না চামেলী। বন্যার স্রোতের মতো হুহু করে উদ্বেলিত অশ্রু তার দুই গণ্ডদেশ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। কান্না থামিয়ে আবার বলতে লাগলো "দু'জনের একজনও সুখী হ'তে পারিনি। বড় ইচ্ছা ছিল, একবার দিদির পায়ের ধূলো নেবার, একবারটি তার কাছে ক্ষমা চাইবার। কিন্তু সে সাধ আর পূর্ণ হ'লোনা। "উঃ—চারুদি, বুকের ডান পাশটা যেন কেমন করছে।"

"নম্বুর মাকে বলবো ওষুধটা মালিশ করে দিতে ;"

"না, থাক্।"

"থাকবে কেন—মালিশটা করুক না—কমে যাবে !"

"আর কমেছে !" —

ঠিক এমনি সময় আশীষ নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢুকলো। গায়ের সার্টটা খুলতে খুলতে উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাকায় চামেলীর মুখপানে। জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন আছ চামেলী ?"

"তুমি এসেছ ?" কেমন যেন একটা বেদনার স্বর চামেলীর কণ্ঠে।

"হাঁ চামেলী।" বলেই তার বিছানার পাশে একটু জায়গা করে বসে পড়ল আশীষ।

পথের কষ্টে আশীষকে বড় মলিন, বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল চামেলী, "পেলে না বুঝি দিদির সন্ধান "?

আশীষ চামেলীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে, তার অবস্থা দেখে বুঝতে পারলো আর বেশী দিন ওকে রাখতে পারবে না। ভাবতেই আশীষের প্রাণটা ডুকড়িয়ে কেঁদে ওঠে।

"কি ভাবছো অমন করে ?" ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে চামেলী। "সত্যি কথাটি বুঝি বলতে পারছো না ?— আমি ব্যথা পাবো বলে ?"

"না, না চামেলী, তা নয়। সত্যি কথাই বলছি—আমি, আ—মি পেয়েছি রাণীর সন্ধান।" বলেই হাঁপাতে থাকে আশীষ। বোধহয় তার মনের দো-টানা ভাবটাকে একেবারে চেপে ফেলবার জন্যে।

"পেয়েছ ? —কোথায় ?"

"নবদ্বীপে।"

"নবদ্বীপে ? —তোমার সঙ্গে এলেন না ?"

"না, অসুখ করেছে, জ্বর হয়েছে।"

একটু ম্লান হাসি হেসে বললে চামেলী, "তাহলে আমার স্বপ্নটাই ফললো !"

"স্বপ্ন ?" আশীষ চম্‌কে উঠলো।

"হ্যাঁ স্বপ্ন।" বলতেই চামেলীর দু'গাল বেয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগলো। আস্তে আস্তে থেমে বলতে লাগলো—"দেখেছি ঐ নবদ্বীপেই—দিদি আর খোকনকে—তুমি ফিরিয়ে পেয়েছ। নিয়েও এসেছ—ওদের—এখানে। তখন—আর আমি নেই !" বলে পরক্ষণেই বুকের ব্যথায় সজোরে তার বুক চেপে ধরে "উঃ মাগো" বলে যাতনায় চীৎকার করে ওঠে।

চামেলীর অবস্থা দেখে আশীষের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তার দুর্ব্বল মাথাটা সযত্নে বালিশের উপর তুলে, আলতোভাবে গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে সজল চোখে ও ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে—না ?"

"না, না—ওগো না—আমার কিছু হয়নি।"

কিছুক্ষণ বাদে আশীষ লক্ষ্য করলো চোখ দুটো চামেলীর বোঁজানোই আছে, কিন্তু বড় বড় করে জলের ধারা বেরিয়ে আসছে।

আশীষের বুকের মধ্যে একটা মোচড় খেয়ে উঠ্‌লো এই করুণ দৃশ্য দেখে। সে এক হাতে চামেলীর রুগ্ন বুকখানায় আলতো একটা চাপ

দিয়ে তার মুখটা একেবারে চামেলীর মুখের উপর নামিয়ে আনলো। শুনতে পেলো চামেলী চোখ বুঁজিয়েই কেঁদে কেঁদে বলছে, "দিদি, জানি কেন তুমি এলেনা, কেন তোমার এ অভিমান। কিন্তু আমি চলে গেলে তো আসবে? তখন আমার বাবুলকে তুমি ক্ষমা করো দিদি, ও শিশু—ওর কোন অপরাধ নেই।

"উঃ, চারুদি—" "আমায় একটু জল।"

উঠে গেল চারুদি জল আনতে। নীরবে হাত বুলোতে থাকে আশীষ চামেলীর মাথায় ও বুকে। নির্নিমেষ হ'য়ে তাকিয়ে থাকে চামেলী আশীষেরই মুখের দিকে।

চোখের জল সম্বরণ করতে পারে না আশীষ। চামেলীর সামনেই শিশুর মত কেঁদে ফেলে সে।

এমন সময় জল নিয়ে এলো চারুদি।

আশীষের দিকে তাকায় চামেলী। জিজ্ঞাসা করলে, "আমার বাবুল?" পাশের ঘরে ঘুমিয়ে ছিল বাবুল। চারুদি ছুটে গেল বাবুলকে আনতে।

চামেলীর কণ্ঠস্বর ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে চোখের জ্যোতিও ধীরে ধীরে কমে এলো। এই সময়-টুকুর মধ্যে চামেলীর মুখের পরিবর্তন দেখে আঁতকিয়ে উঠলো আশীষ। আশীষের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ধীরে ধীরে দু'চোখ মুদিত হয়ে এলো চামেলীর। সে চোখ আর খুললো না। তারপর—সব শেষ।

উন্মাদের মত আশীষ চামেলীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলো, "চামেলী, চামেলী, এই যে বাবুল। চেয়ে ছাখো, চেয়ে ছাখো একবার, তোমার বাবুল কাঁদছে, চামেলী!"

আর চামেলী—কোথায় চামেলী—কে দেবে সাড়া আজ তাদের

ডাকে? জীবনের সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দিয়ে, জীবনের সকল সুখ দুঃখের খেলা শেষ করে মাত্র কিছুক্ষণ আগে চামেলী যাত্রা করেছে, যে যাত্রা থেকে মানুষ আর কোনদিন ফেরে না। চামেলীর এ যাত্রা কেবল মহাযাত্রা নয়, এ তার সুখ-যাত্রা। কারণ এবার সে যেখানে যাচ্ছে সেখানে রিহার্স্যাল রুমের পঙ্কিলতা নেই, আশীষের বোকামি ও নিষ্ঠুর চপলতা নেই, রাণীর ভুল-বোঝা নেই, নেই কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মান-অভিমানের সংঘাত।

সদ্যো মাতৃহারা বাবুলকে বুকে চেপে নিয়ে আর্তনাদ করতে করতে বলে উঠল আশীষ, "ওরে বাবুল, তোর মা নেই রে, মা—নেই।"

মানুষ কি ভাবে আর কি হয়। কত কল্পনার জালই-না সে বোনে। কত মধুময় সুখের স্বপ্নই না সে দেখে। জলবুদ্‌বুদের ন্যায় আসা-যাওয়া করে এই কল্পনা তার মনের ভেতর।

চামেলীকে এ বাসায় এনে আবার কত রঙীন স্বপ্নই-না দেখেছিল আশীষ। সে ভেবেছিল যদি রাণী বেঁচে থাকে, যদি তার সন্ধান পায়, যদি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে, তা হ'লে হয়তো বা রাণী ও চামেলীকে নিয়ে আবার সে সুখী হ'তে পারবে। কিন্তু তার সকল আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা, এক নিমেষে ধূলিসাৎ করে দিয়ে, তার হৃদয়খানাকে ভেঙ্গে চুরমার করে, চামেলী ইহলোক থেকে বিদায় নিয়ে চিরকালের মত চলে গেল। আশীষের বুকখানা জ্বলন্ত চিতার ন্যায় দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল।

একুশ

"দ্যাখ্ রাণী, আমি বোধহয় আর সেরে উঠবো না।"

"কে বললে তুমি সেরে উঠবে না? কবিরাজমশাই বলে গেলেন আর কিছুদিন গেলেই তুমি একেবারে ভাল হয়ে যাবে।"

"আরে, ওরা অমনিই বলে। বলি, এ বুড়োকে এমনি করে আর কত-দিন ধরে রাখবি মা? আমার যে যাবার সময় হয়েছে।"

জগুর কথা শুনে রাগ করে উঠল রাণী। জগুর মাথার কাছ থেকে পাখাখানা ঠাস্ করে মাটিতে ফেলে দিয়ে বললে, "এম্‌নি ভাবে যদি বকতে থাকো, তাহ'লে আমি এক দণ্ডও এখানে বস্‌বো না।"

"আহা, রাগ করিস্‌নে মা—রাগ করিস্‌নে। বেশী দিন আর এ বুড়ো-ছেলে তোকে জ্বালাতন করবে না। কিন্তু আমি মরেও যে শান্তি পাবো না মা, যদি মরবার আগে দাদু ও তোর একটা কিছু করে না যেতে পারি। তোদের কথা ভাবতে আমি আজকাল বড়ই অস্থির হয়ে পড়ি।" বলতে বলতে জগুর চোখদুটী ছল্ ছল্ করে উঠে।

জগুর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলোতে বুলোতে রাণী সাহস দিয়ে বললে, "এত কেন ভাবছো আমাদের জন্যে?—তুমি তো সেরেই উঠেছো।"

"দূর! আমি আর ভালোই হবো না! আমার মন যেন তাই আমাকে বারে বারে বল্‌ছে! যাক্ একথা বলে তোকে আর ব্যথা দেবো না মা। কিছুদিন হ'লো তোকে একটা কথা বলবো বলবো করে বলা হয়নি। দ্যাখ মা, এই দুনিয়ায়, মানুষের সামান্য ভুল ত্রুটীর জন্যে, সংসারে কতই না গোলমাল হ'য়ে যায়, কত সংসার পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, কত অমূল্য জীবন অকালে ঝরে পড়ে, এমন কি একটা রাজ্য পর্য্যন্ত ধ্বংস হ'য়ে থাকে।"

কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে রাণী জগুর মুখের দিকে।

বলে যায় জগু, "তাই আমি বলছিলাম কি,—মানুষ মাত্রই ভুল করে, সামান্য কারণে ও অকারণে হারিয়ে ফেলে তারা তাদের বিচার শক্তি। যে ভুল করে, সে যদি তার ভুল বোঝে, অনুতপ্ত হ'য়ে ক্ষমা চায়, তা হলে তাকে ক্ষমা করাই উচিত। তোর এই বুড়ো বাপের কথাটাই বলি। যদি কোন দিন তোর উপর কোন অন্যায় অবিচার বা কঠোর ব্যবহার করে ফেলে পরে ভুল বুঝতে পেরে যদি অনুতপ্ত হয়, তা হলে কি করবি ?—বুড়োকে ক্ষমা করবি নে ?"

রাণীকে নীরব দেখে আবার বলে যেতে লাগল জগু, "জানি মা—জানি, ক্ষমাই করবি। কারণ ভুল করা মানুষের স্বভাব, আর মানুষ মাত্রই ভুল করে। তাই বলছিলাম কী,—তোর মনে ব্যথা লাগবে তাও জানি। তবুও মা তোকে বলছি, কত বড় অন্যায় অবিচারই-না আশীষ তোর উপর করেছে। হাজার হোক্ সে তোর স্বামী। সে যদি কোন দিন তার ভুল বুঝতে পেরে, অনুতপ্ত হয়ে তোর কাছে আসে, তোকে নিয়ে যেতে চায়, তাহ'লে তুই তাকে ফিরিয়ে দিস্‌নি মা।"

ভুল, ত্রুটী, অন্যায়, অবিচার আর ক্ষমা কথা কয়টী মনে মনে ভাবতে ভাবতে রাগে ও অভিমানে ফুলতে থাকে রাণী। তার কি ইচ্ছে করেনা, তার কি সাধ হয়না স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে ? কিন্তু সাধ হ'লে কী হবে, তার সেই সাধে বাদ সেধেছে আরেকটি মেয়ে। দাঁড়িয়ে আছে সে তার পথের কাঁটা হয়ে। আশীষ যদি তার সঙ্গে পূর্ব্বের মত ব্যবহার না করে, আবার যদি অবহেলা, অনাদর করে তাড়িয়ে দেয়, তা হলে ? —এই আশীষই একদিন তাকে বলেছিল তোমার মত লক্ষ্মী-প্রতিমা যার ঘরে, তার স্বামীর কখনও মতিভ্রম হ'তে পারে না। কিন্তু সেকথা কী রাখতে পেরেছে আশীষ ?

ভাবতেই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে রাণীর মন। না—সে কিছুতেই সতীন নিয়ে স্বামীর ঘর করতে পারবে না।

"চুপ করে রইলি কেন মা ?" পুনরায় প্রশ্ন করে জগু।

"মা, সে অসম্ভব বাবা।" বল্‌তে বল্‌তে রাণীর কণ্ঠ আবেগে ও ঘৃণায় কেঁপে উঠলো।

রাণীর জবাব শুনে মুষড়ে পরে জগু। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে চোখ বুজে। হঠাৎ ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস নির্গত হলো তার।

"কী হলো ?" ভয় পেয়ে যায় রাণী।

"না—কিছু হয়নি মা—কিছু হয়নি।"

"মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেব ?"

"দে মা।" বলে জগু আবার চোখ বুঁজলো।

খানিকবাদে তাকালো জগু ধীরে ধীরে। রাণীর একখানা হাত বুকের উপর রেখে আবার বললে, "ছাখ্ মা, মানুষ কেন মানুষকে ভুলে যাবে, মানুষ কেন মানুষকে ঘৃণা করবে, মানুষ মানুষকে ভুলে যায় বলেই তো জগতে কতই না অনাসৃষ্টি ঘটে থাকে। তাই বলি, মানুষ লড়বে অন্যায়ের সাথে, ঘৃণা করবে পাপকে, কিন্তু পাপীকে নয়। মানুষ মানুষকে ভালবাসবে, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ আর ভালবাসা দিয়ে আপন করে নেবে—ঐ যে পারে, সেই তো প্রকৃত মানুষ। সেই-খানেই তো প্রকাশ পায় মানুষের চরম মহত্ব। মা, আমার কথাটা তোর রাখতেই হ'বে। তুই আমায় ছুঁয়ে বল্, কোনদিন যদি আশীষ সত্যিই তোকে নিতে আসে, তুই অমত করবি নে ? বল্—চুপ করে রইলি কেন মা ? —চুপ করে থাকিস্‌নে। আমায় কথা দে, তুই যাবি ? তা না হ'লে আমি মরলেও আমার আত্মা কখনও শান্তি পাবে না।" বলেই হাত দিয়ে তার চোখের জল মুছে নিলে ব্যাকুল চিত্তে।

স্থির থাকতে পারলো না রাণী, জগুর এই ব্যাকুলতা ও কান্না দেখে। ভাবতে থাকে জগুর যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো—যে মানুষটির আশ্রয়-কোলে তার সব কিছু নিয়ে আজও বেঁচে আছে সে মানুষের মতো। আবার শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে সে জগুর বার্ধক্য ও কঠিন পীড়ার কথা মনে করে। পাছে প্রাণে আঘাত লাগে জগুর, সেই ভয়ে ও নিজের নিঃসহায়তা চিন্তা করে বলে উঠলো ধরা গলায়, "বেশ তাই হ'বে বাবা।"

রাণীর একটা কথাতে জগুর চোখ দুটী সহসা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। তার পিঠে নিজের রুগ্ন হাতখানা বুলোতে বুলোতে বললে, "আমি বলছি মা, তোর দুঃখের দিন কেটে যাবে—আবার সব ফিরে পাবি, —আবার তুই সুখী হবি।"

বাইশ

আজ আশীষ একা—বড় একা। শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাকে সান্ত্বনা দেবার মত আপন জন বলতে আর কেউই রইলো না। ঘুরে ঘুরে কেবল মনে পড়তে লাগল চামেলীর নানা প্রসঙ্গ আর বিশেষ করে সেই স্বপ্নের কথা। চামেলীর পরেই জাগে বাবুলের কথা—বাবুলের ভবিষ্যত। এখন সে কী করবে,—কোথায় যাবে? কিছুই ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে পায়চারি করতে থাকে ঘরের ভেতর। হঠাৎ মনে পড়ল তার প্রণবদা আর স্নেহময়ী বৌদি বীণাকে। অন্ধকারে যেন একটু আশার আলো দেখতে পেল সে। তাদের সঙ্গে বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। বিয়ের পর সে নিজেও এঁদের কোন খোঁজ খবর করেনি। চিত্তের অস্থিরতা হেতু ভালো-মন্দ আর বিচার না করে প্রণবদার কাছে গিয়ে কয়েকটা দিন থাকবে, অবশেষে তাই ঠিক করলো। দিন কয়েক পরে বাবুলকে সঙ্গে করে হুগলী অভিমুখে রওনা হলো আশীষ।

তেইশ

হুগলী সহর। আশীষ বাবুলের হাত ধরে ষ্টেশন থেকে নেমে, গ্রামের রাস্তা ধরে প্রণবের বাড়ীর দিকে যেতে লাগলো। তখন রাত্রি গোটা আটেক হবে। এরই মধ্যে যেন সাড়া গ্রামখানি গভীর নিদ্রায় সুপ্ত। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ—খুলে দিয়েছে তার অফুরন্ত রূপের ভাণ্ডার—ভাসিয়ে দিয়েছে সাড়া গ্রামখানিকে তার সেই স্নিগ্ধ আলোয়। অদূরে ঝোপে ঝাড়ে ঝিল্লীর ঝিঁঝি রব। রাস্তার মাঝে মাঝে বাঁশ বনের কচ্‌কচানী। চারিদিকে তাকাতেই একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললো আশীষ। কত পুরাতন—কত পরিচিত—কত স্মৃতিতে ভরা এ সেই জায়গা। হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ালো আশীষ প্রণবের বাড়ীর কাছাকাছি এসে। —দূরে ঐতো সেই যমডোবা যার চারিধারে আকাশ-ছোঁওয়া গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে যেন এক একটা বিরাট দৈত্যের মতো। এই যমডোবা থেকে একদিন সে রক্ষা করেছিল রাণীকে। কিন্তু আজ—কোথায়—কোথায় সেই রাণী! ঐ তো কাছেই সেই সিমেণ্টের ঘাট—যেখানে—এম্‌নি এক জ্যোৎস্না রাতে পাশাপাশি ব'সেছিল তারা দুজনে। কত কথাই না হয়েছিল তাদের মধ্যে। বিধাতার কি নিষ্ঠুর পরিহাস, আজ সেই কিনা অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে সেই জায়গায়। ইচ্ছা হোল তার ছুটে গিয়ে ডুবে মরতে—দূরে—ঐ—যমডোবায়। —পরক্ষণেই ভাবতে থাকে বাবুলের কথা। কিন্তু বাবুল? —বাবুলের কি হবে? না, না, সে মরতে পারে না। চামেলী মরে গিয়ে তাকে শাস্তি দিতে পারে—রাণী নিরুদ্দেশ হ'য়ে তাকে জব্দ করতে পারে—কিন্তু তাই বলে অসহায়, নিরপরাধ, মাতৃহীন শিশু বাবুলকে একাকি রেখে, স্বেচ্ছায় পৃথিবী থেকে বিদায়

নিতে পারে না সে। আবার এগুতে লাগলো আশীষ প্রণবের বাড়ীর দিকে।

প্রণবের বাড়ীর সামনে এসে দোরে ঘা দিয়ে ডাকল—"প্রণবদা বাড়ী আছ? প্রণবদা—"

"কে?" ভেতর থেকে সাড়া এলো।

আশীষ বেশ বুঝতে পারলে, এ কণ্ঠস্বর তার স্নেহময়ী বৌদির। দোর খুলে বাইরে তাকাতেই থম্‌কে দাঁড়াল বীণা, চম্‌কে গেল আশীষ। "একি! এইকি তার সেই লক্ষ্মী-মূর্তি বৌদি! একি বেশ তার! একি চেহারা! অমন সুন্দর চোখ দুটী কোটরে বসে গেছে। চোখে-মুখে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে। শুকিয়ে বেরিয়ে গেছে কণ্ঠের দু'খানা হাড়। মাথার চুলের রাশি উস্‌খো-খুসকো। পরিধানে তাঁর থান কাপড়।" বীণার দিকে তাকিয়ে আশীষের বাক্‌শক্তি যেন রহিত হয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো উভয়ে উভয়ের পানে তাকিয়ে। এভাবে কিছুক্ষণ কাটবার পর এগিয়ে এলো বীণা আশীষের সামনে। তার একটী হাত রাখলে আশীষের পিঠে। ধীরে ধীরে সজল নয়নে বললে, "জানি ভাই, তোমার প্রাণে খুব লেগেছে। যা স্নেহ করতেন তোমাকে।" বলতেই আশীষ বৌদি! বৌদি! বলে দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো শিশুর মত। "বৌদি! দাদা এত শীগ্‌গির আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন, আমি যে ভাবতেই পারিনে। সত্যি আমি বড় বেইমান, বড় নেমকহারাম। তোমাদের অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে একদিনের তরেও তোমাদের খোঁজ খবর করিনি।" কান্নার ঢেউ ঘরময় হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। খানিকবাদে আশীষ বললে, "কিন্তু প্রণবদাকে আমার মুখ দেখাবার উপায় ছিলনা—তা যদি জানতে—।"

"তোমার দাদা জানতেন বৈ কি।" গম্ভীর হয়ে বললে বীণা।

"য়্যাঁ!—জানতেন প্রণবদা?" বিস্ময়ে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে

আশীষ।

"রাণী একখানা চিঠি লিখে তোমার দাদাকে জানিয়েছিল। চিঠিখানা পেয়ে বড় মর্ম্মাহত হয়েছিলেন তোমার দাদা, জানোতো রাণী তাঁর কত আদরের ছিল। তার নিজের তো কোন বোন ছিলনা। এসবই তো তুমি জানো। তোমার দাদা চলে যাবার একদিন আগে আমায় বলেছিলেন, আমি একটু ভালো হলে রাণীকে বাসায় নিয়ে আসবো। তারপর দুটো দিন যেতে না যেতেই রক্তের চাপটা বেড়ে গেল। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। আর জ্ঞান ফিরে এলো না—" বীণার দু'চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো, আর সে বলতে পারলো না।

বীণার অসমাপ্ত কথার শেষে অধীর হয়ে বলে উঠল আশীষ, "কত পাপই না করেছি—প্রাণে কত আঘাত না দিয়েছি। সেই পাপেই আজ দাদাকে হারালাম। বৌদি, তুমি আমায় ক্ষমা করো না, কখনও ক্ষমা করো না। আমাকে মেরে ফেললেও বোধহয় এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।"

"ছিঃ—এসব কি বলছো তুমি? ভাগ্যে যা লেখা আছে, কে খণ্ডন করবে বলো?" বলে সে আঁচলটা তুলে চোখের জল মুছে নিলো। তারপর উভয়ে নীরব। সেই নীরবতা ভঙ্গ করে কিছুক্ষণ বাদে বীণা আশীষকে জিজ্ঞাসা করলে, "এ ছেলেটি কে?"

উত্তর করলে আশীষ, "চামেলীর। এর মার উপর অভিমান করেই নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে রাণী।"

অন্ধকার রাস্তা থেকে মূর্ছিত অবস্থায় কুড়িয়ে আনা চেহারাটি মনে পড়তে থাকে বীণার। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলে, আশীষকে। "এখন তবে কী করবে ঠিক করেছ?"

"তাই তো ভাবছি কেবল। কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছিনে। কি

যে মুশ্‌কিলে পড়ে গেছি—এই সন্তো-মাতৃহারা ছেলেটিকে নিয়ে! ওকে ছেড়ে এক মুহূর্তও কোথাও যাবার উপায় নেই।" এই বলে আশীষ এক একটী করে আন্তোপান্ত সমস্ত ঘটনা খুলে বললে বীণার কাছে। একটী কথাও গোপন করলে না।

স্তব্ধ হয়ে শুনতে থাকে বীণা। কথার শেষে সজল-নয়নে বাবুলকে টেনে নিল কোলে। তারপর বললে আশীষকে, "সবই তো শুনলাম ভাই। কিন্তু এখন তো তোমার চুপ করে থাকলে চলবে না। ছেলেটিকে বাঁচাতে হবে। মানুষ করে তুলতে হবে।" বলে একটু চুপ করে থেকে পুনরায় বললে, "ওর মাতো পথ পরিষ্কার করেই দিয়ে গেছে। তোমাকে যেমন করেই হোক, রাণীকে খুঁজে ফিরিয়ে আনতে হবে।"

"আচ্ছা বৌদি, রাণী যে চিঠিখানা প্রণবদাকে লিখেছিল, তাতে কি কোন ঠিকানা ছিল?"

"না ভাই, কোন ঠিকানা ছিল না। শুধু চিঠিখানার শিরোনামায় নবদ্বীপ কথাটি লেখা ছিল।"

ভাবতে থাকে আশীষ চামেলীর স্বপ্ন—এবং সেই সঙ্গে মনে পড়ল তার, নবদ্বীপে গুরুর মেয়ে রাণী ও তার নাতি, খোকনের কথা।

"কি ভাবছো ভাই?"

—অনেক ভেবে-চিন্তে বলে উঠলো আশীষ, "রাণীর সন্ধানে নবদ্বীপেই যাবো ভাবছি।"

"দিদি!"

"কে, শিবু?"

"হ্যাঁ দিদি। আমার সব গোছ-গাছ হ'য়ে গেছে। কাল ভোরের গাড়ীতেই রওনা হ'তে হ'বে। টিকিট কি আজকে কেটে নিয়ে আসবো?"

আশীষ অচেনা শিবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "কে বৌদি ?"

"আমার পিস্‌তুতো ভাই।"

"মাসীমা বুঝি যাবেন ?" প্রশ্ন করে আশীষ।

একটু বিষাদের হাসি হাসলো বীণা। "মা নেই ভাই! তিনি তোমার দাদার আগেই চলে গেছেন।"

"মাসীমা নেই !!" আঁতকিয়ে উঠল আশীষ।

"না ভাই। বয়স হয়েছিল। ভুগছিলেন অনেক দিন।"

"তবে কি তুমি কোথাও যাচ্ছ ?" উদ্‌বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল আশীষ।

"হ্যাঁ ভাই।"

"কোথায় বৌদি ?"

"কাশী।"

"কাশী ?"

"হ্যাঁ, ঠাকুরপো। কালকেই আমি যাবো ঠিক করেছি।"

হঠাৎ বীণার পা দুটো জড়িয়ে ধরে আশীষ। বলে উঠলো, "কাশী তোমার যাওয়া হবেনা, বৌদি!" আশীষের এই আচরণে বীণা স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। জোর ক'রে পা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেও কোন ফল হলো না।

"কেন, ভাই ?"

"তুমি তো জানো বৌদি, কাশী-গয়া সবই আমাদের মনে; মন তৈরী হলে ঘরে বসেই কাশীর পুণ্যস্পর্শ পাওয়া যায়। আর তা ছাড়া আমি বলছি—সেই দূর প্রবাসে একা থাকা কত বিপজ্জনক তা তোমার ধারণা নেই।"

"এ তুমি আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে বলছো। এখন পা-টা ছাড় দেখি, কতক্ষণ এমন আড়ষ্ট হয়ে থাকবো, কী পাগল তুমি, ঠাকুরপো!"

আশীষ পা ছেড়ে দিয়ে বলতে লাগলো, "না, বৌদি, সত্যি কথা।

আমি পাগল হই আর যাই হই, কাশী তোমার কিছুতেই যাওয়া হবে না। আমি যখন এসে পড়েছি তখন কঠোর জীবনে তোমাকে প্রবেশ করতে দেবো না।"

"কিন্তু, আমার যে আর গতি নেই, ভাই।"

"বৌদি, আমাকে তুমি আর বিশ্বাস ক'রতে পারো না, না?"

"কেন?"

"যদি বলি, আমি তোমার বাকি জীবনের সেবার ভার নেবো?"

"তাই কি হয়? এও তোমার পাগলামি! তুমি নিজে এখন বিপন্ন—"

"তাই বুঝি তুমি বিপন্নকে এড়িয়ে থাকতে চাও? তবে কেন প্রথম জীবনের বিপদে টেনে নিয়েছিলে তোমার স্নেহনীড়ে? আগ-রক্ষা যখন ক'রেছ, তখন শেষ-রক্ষা ক'রবে না কেন বলো?"

"কিন্তু আমি যে একেবারেই অসহায়, এখন আর আমি তোমাকে কী করে রক্ষা করবো, ভাই?"

কথায় কথায় বীণা যে জড়িয়ে পড়ছিলো আশীষের জালে তা বীণাও বুঝতে পারেনি। আশীষ বললো, "বৌদি, জীবনে কবে মায়ের স্নেহ পেয়েছিলাম মনে পড়েনা, কিন্তু বৌদি হ'লেও তোমার কাছ থেকেই পেয়েছি মাতৃস্পর্শ। তাই আজ কেন তুমি সত্যিকারের মা হ'য়ে এসো না আমার ভাঙা ঘরে? তোমার বৌদি-রূপ দেখে ধন্য হয়েছি, এবার মাতৃ-রূপ দেখে জন্ম সার্থক করি। পারবে না বিশ্বাস করতে আমাকে?"

"কিন্তু—"

"কিন্তু কিছু নেই, বৌদি, তুমি এলে, আমার মন বলছে, আবার আমি দাঁড়াতে পারবো জীবনে। আর, তোমার আশীর্ব্বাদে রাণীকেও আমি নিশ্চয়ই ফিরে পাবো, আর রাণী পাবে তোমার সেবায় তার জীবনের

সফলতা !— —কথা দাও, বৌদি আমাদের এই স্বপ্নকে তুমি সত্য হতে দেবে ?"

"দেখ্ দেখি শিবু, কি করি এখন বলতো ?" বীণার মুখে সহাস্য প্রসন্নতা।

"শিবু আর কি দেখবে বৌদি, ঐ যা তোড়-জোড় করা আছে, ঠিকই আছে, খালি কাশীর বদলে ক'লকাতার টিকিট কাটা হবে।"

"তুমি, ভাই, অসম্ভব সম্ভব করতেই আছো।"

"আর তুমি আছো আমার লক্ষ্মীছাড়া জীবনের মোড় ঘোরাতে!"

চব্বিশ

"এই খুকু ! শোন।"

"কী," বলে সোণা পুতুল খেলা রেখে যুবকটীর সামনে এগিয়ে এলো।

"তুমি এ বাড়ীতে থাকো ?"

"না—তো।" ঘাড় নেড়ে জানালো সোণা।

"আমাদের বাড়ী, ঐ যে আম গাছটা দেখতে পাচ্ছ—ঐ খানে।" এই বলে আঙুল দিয়ে বাড়ীটা দেখালে।

যুবকটী সোণার নির্দেশ মত গাছটির দিকে তাকিয়ে বললে,—"ও।"

"আচ্ছা—এ বাড়ীতে এখন কে আছেন ?"

"বুড়ো দাদু আছেন। আর কেউ নেই।"

"খোকন নেই ?"

"উঁহু, খোকন আর রাণুপিসি, রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরে গেছে।"

"দাদু কী করছেন ?"

"তুমি জানো না—দাদুর অসুখ করেছিলো ? —দাদু এখন ভাল হয়ে গেছে। তাই রাণুপিসী পূজো দিতে গেছে।"

"তোমার দাদুর কাছে আমায় একটু নিয়ে যাবে ?"

ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালো সোণা।

"কেন ?"

বিজ্ঞের মতো বললে সোণা, "মানা আছে।"

"মানা আছে ? —কার ?"

"রাণু পিসীর।"

চুপ করে থাকে আশীষ। কী করা উচিত বুঝতে পারে না।

আশীষের কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে, বিজ্ঞের মতো পুনরায় বলে উঠলো সোণা, "তুমি কিছু বোঝ না। দাদুর মেয়ের নাম রাণু পিসি।

আর রাণু পিসীর ছেলের নাম খোকন। জানো না, দাদু ঘুমিয়ে থাকলে, কবিরাজ দাদু তাকে বিরক্ত করতে বারণ করে গেছে? তাই রাণু পিসী আমায় বলে গেছে, খবরদার সোণা, বাড়ীতে কেউ এলে দাদুর ঘুম ভাঙাবেনা। তুমি ঐ ঘরে বসো। দাদু এখনই উঠবে।"

অগত্যা, আশীষ সোণার কথা মতো, বাইরের ঘরে বাবুলকে নিয়ে জগুর প্রতীক্ষায় বসে রইল।

ঘুম থেকে উঠে, জগু বাইরের ঘরে পা দিতেই, দেখতে পেল আশীষকে। তাকে দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে "কখন এলে? সব খবর ভালো তো?"

"আজ্ঞে, এক রকম। আপনি কেমন আছেন? শুনছিলাম আপনার অসুখ করেছিল।"

"হ্যাঁ বাবা, শরীরটা আজকাল মোটেই ভালো যাচ্ছে না। মাঝে বেশ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলাম। রাণীমার সেবায় ও যত্নে এ-যাত্রা রক্ষা পেলাম।" কথাটা বলেই কি যেন ভাবতে থাকে জগু। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার জিজ্ঞেস করলে "আমার অসুখের খবর তুমি শুনলে কার কাছে?" অদূরে সোনা দাঁড়িয়েছিল তাকে দেখিয়ে বললে—"ঐ খুকু বুঝি ব'লেছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আচ্ছা, আগে খুকুকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না," একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল আশীষ জগুকে।

একটু মৃদু হেসে উত্তর করলে জগু, "খুকু আমাদের পাড়ার ঠাকুর-বাড়ীর মেয়ে। ভারী বুদ্ধিমতী ও লক্ষ্মী মেয়ে ঐ খুকু। খোকনের সাথে ওর ভারী ভাব। পাড়ার সবাই খুকুকে খুব স্নেহ করে। আমার রাণীমা খুকুকে 'সোণা' বলে ডাকে।" এইভাবে কথা বলতে বলতে বাবুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে জগু, "ছেলেটা বুঝি তোমার—ভারী সুন্দর মুখখানা তো!"

উত্তরে আশীষ শুধু একটু হাসলো!

জগু বাবুলকে তার কাছে টেনে নিয়ে শুধালো, "তোমার নাম কি দাদু? —জানো—আমি তোমার দাদু হই?"

বাবুলকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে জগু, "কী দাদু, কথা বলছো না যে? —মাকে ছেড়ে এসে মন কেমন করছে, না?"

জগুর কথায় ফ্যাল্-ফেলিয়ে তাকিয়ে থাকে বাবুল। মুখ দিয়ে তার কোন কথাই ফুটলো না।

সদ্যো-মাতৃহারা শিশু বাবুল। মাতৃ বিয়োগের ব্যথায় জর্জ্জরিত তার সমস্ত হৃদয়। জগুর মুখে মার নাম শুনে তার বুভুক্ষুচিত্ত মাতৃশোকে হাহাকার করে কেঁদে উঠলো। নীরবে তার পদ্মের মতো চোখ দুটী দিয়ে মুক্তোর মতো কয়েক ফোঁটা জল দু'গাল গড়িয়ে টপ্ টপ্ করে পড়তে লাগলো।

অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ে জগু। "কী হলো—কাঁদছো কেন?"

"ওর মা নেই! মাসখানেক হ'লো মারা গেছে।" গম্ভীর হয়ে বলল আশীষ।

"য়্যাঁ, এর মা নেই!" বলতেই জগু যেন প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলো। সে ভাবটা সামলে নিয়ে বলতে লাগল, "অদ্ভুত এ সংসার! অদ্ভুদ ভগবানের লীলা! তিনি কখন যে কাকে কী অবস্থায় রাখেন তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই! আহা, মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হলো এই দুগ্ধ-পোষ্য শিশু!"

"দাদু!"

"কেন রে সোণা?"

"বাইরে কে ডাকছে তোমায়।"

"কে এলো আবার এ সময়? এখানে পাঠিয়ে দে। তোর পিসিমারা এসেছে?"

"না দাদু।" বলে সোণা লোকটাকে ডেকে নিয়ে এলো জগুর সামনে। জগুকে দেখেই বলে উঠল লোকটি, "এই যে বুড়ো কর্ত্তা পেল্লাম হই। মেজকর্ত্তা পাঠিয়ে দিলেন আপনার কাছে।"
"কেন রে ?"
"কীর্ত্তন শুনবেন না ?"
"ওঃ, আমার তো মনেই ছিলনা ! কাল বলে দিয়েছিলেন তিনি। আচ্ছা বাবা, তুমি এসো আমি যাচ্ছি।" দোটানায় পড়ে জগু ভাবতে থাকে কি করবে ? কীর্ত্তন শুনতে যাবে, কি যাবে না।
আশীষ বুঝতে পারলে জগুর মনোভাব। বললে, "তা হ'লে আমি এবার উঠি?"

ব্যস্ত হয়ে বললো জগু, "এক্ষুনি এসে এক্ষুনি চলে যাবে ! তা কি হয় ? খোকনের সঙ্গে দেখা করবে না ? খোকন যখন জানতে পারবে তুমি এসেছিলে তখন ওর যে ভারী মন খারাপ হ'বে। খোকন কিন্তু একটুও তোমায় ভোলেনি। বরং বসো তুমি, আমি একটু ঘুরে আসি। খোকনদের আসার সময় হ'য়ে গেছে। এক্ষুনি ফিরে আসবে ওরা। আমি না এলে যেতে পারবে না কিন্তু। দাদু এসেছে। ও একটু কিছু মুখে না দিয়ে যাবে—সে হয়না। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই ফিরে আসবো আমি। বাইরে সোণা পুতুল খেলছে, ওর সঙ্গে নয় কথা বলো।"
"আচ্ছা, আপনি আসুন।"

পঁচিশ

জগু কীর্ত্তন শুনতে চলে গেলে আশীষ বাবুলকে নিয়ে বসে রইল বাইরের ঘরে। সোণা একমনে পুতুল নিয়ে খেলা করছে। ইচ্ছে হ'লো না আশীষের তাকে বিরক্ত করতে—তার খেলা ভাঙতে।

কিছুক্ষণের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের পূজো দিয়ে প্রসাদের থালাখানা হাতে করে বাড়ীতে ফিরে এলো রাণী। বারান্দার দিকে তাকিয়ে সোণাকে ডেকে বললে, "বড্ড দেরী হয়ে গেছে সোণা। তুমি রাগ করোনি তো ?"

"না পিসীমা, একটুও রাগ করিনি।" বলে পুতুল ও খেলনা গুটাতে লাগলো সে। খোকনকে রাণীর সঙ্গে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "খোকন আসেনি ?"

"ও একটু পরে আসবে নবুর মার সাথে। রাধাকৃষ্ণের আরতি দেখছে। তারপরে রাণী খানিকটা প্রসাদ ছোট্ট একখানা রেকাবে করে সোণার হাতে দিয়ে বললে, "বাড়ীতে সবাইকে দেবে, আর তুমিও খাবে, কেমন ?"

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সোণা একহাতে পুতুলের বাক্স ও অন্য হাতে প্রসাদের রেকাবখানা নিযে ছুটে চললো বাড়ীর দিকে।

তখন সবে সন্ধ্যে হ'য়েছে। আশেপাশে গৃহস্থ ঘরের বাড়ীগুলো থেকে শাঁখের আওয়াজ ভেসে আসছে। রাণী তাড়াতাড়ি প্রদীপটি জ্বালিয়ে, প্রসাদের থালাখানা হাতে নিয়ে, বেরিয়ে এলো জগুর উদ্দেশ্যে বাইরের ঘরে যাবার জন্যে। ঘরে ঢুকে হঠাৎ প্রদীপের আলোতে কার মুখ দেখলে সে। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর ? একি ভুল ? না, না, একি ভুল হবার ? এযে একেবারেই সেই মুখ!

আঁতকিয়ে উঠলো রাণী! হাতের প্রদীপ ও প্রসাদের থালাখানা ঝন্‌ঝন্ শব্দে পড়ে গেল মাটিতে। দপ্ করে প্রদীপটাও গেল নিভে। সঙ্গে সঙ্গে রাণীও বসে পড়ে মাটিতে। এক মিনিটে কি যেন কি ঘটে গেল। প্রদীপ ও প্রসাদের থালাখানা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চমকে গেল আশীষ। অপ্রস্তুত ও ভীত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "একি! আপনি—আপনি পড়ে গেলেন?—লাগলো বুঝি? —এই অন্ধকারে এখন? —খোকন! খোকন! —কিছুই তো বুঝতে পারছিনে?" বলতে বলতে আশীষ অন্ধকারে পকেট থেকে টর্চ্চটা বের করে, সুইচটা টিপতেই বিস্ময়াভিভূত হ'য়ে পরে। মুখ দিয়ে অস্ফুষ্ট স্বর বেরুলো "তু—মি! —তুমি—এখানে?"
তাড়াতাড়ি উঠে, পাগলের মতো পাশের ঘরে পালাবার উপক্রম করতেই রাস্তা আগলিয়ে দাঁড়ায় আশীষ। "যেওনা,—যেওনা, রাণী!"
"ঢের হয়েছে! বলি, আমার কি এখনও নিস্তার নেই? পথ ছাড়, বলছি?"
"না, পথ আমি ছাড়বো না, তোমাকে পাওয়ার পথই খুঁজে বেড়াচ্ছি পাগলের মত হয়ে সেইদিন থেকেই, যেদিন তুমি অভিমান করে চলে এসেছ বাড়ী থেকে। বিশ্বাস কর, রাণী, যদি এ বুকখানা চিরতে পারতুম, তবে দেখাতে পারতুম, এখানে কী আগুন জ্বলছে অহরহ!" —বলেই আশীষ রাণীর হাতখানা আবেগে চেপে ধরে। —"ভুলের কী মার্জ্জনা নেই? এমনি ভাবে রাগ আর অভিমান নিয়ে থেকোনা লক্ষীটি। ফিরে চলো তোমার ঘরে।"
সজোরে হাত ছাড়িয়ে নেয় রাণী। ভুলে যায় তার প্রতিশ্রুতির কথা। উত্তেজিত হয়ে ওঠে সে। ভেসে ওঠে স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে অতীতের সেই ঘটনাগুলো। আর বুঝি বা সইতে পারেনা আশীষকে। আগুন হ'য়ে জবাব দিলে রাণী,—"আমার ঘর বলতে

লজ্জা করছে না ? আমার ঘর যতদিন আমার ছিলো, ততদিন তোমার শত উপেক্ষাতেও আমি তা ছাড়িনি। তখনই ঘর ছেড়েছি, যখন বুঝেছি ঘর থেকে তুমি আমাকে না তাড়িয়ে ক্ষ্যান্ত হবে না। তা, তোমার পথ তো নিষ্কণ্টক করে দিয়ে এসেছি, তবু কেন অপমান করতে এসেছো। যাও, আমাকে তো চাওনি, আমাকে চাইলে আর সেই...... ”

রাণীর চোখে সহসা যেন অগ্নি বর্ষিত হতে লাগলো, কণ্ঠস্বর ঘন ঘন কেঁপে উঠ্‌তে থাকলো, সেই কাঁপা গলায় বেরিয়ে এলো তার চাপা ভৎসর্না,—“অভিনেত্রীকে রাণীর আসনে বসিয়ে এখন সেই ঘরে আমায় ফিয়ে যাওয়ার কথা বলতে লজ্জা করে না ? সরে যাও বলছি !”—কথা কয়টা বলে ফেলেই রাণী হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়ালো।

আশীষ ভয় পেয়ে গেল রাণীর অবস্থা দেখে। সে একটু সরে দাঁড়িয়ে তার কৈফিয়ৎটা গুছিয়ে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই টলমল্ ক'রতে করতে রাণী দরজা দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে পড়লো। আশীষ শুনতে পেলো, সে, সেই ভাবেই হাঁপাতে হাঁপাতেই বলে চলেছে, “না, না,—এই আমার ঘর, এই আমার সংসার, এই জায়গাই আমার শান্তি—এই জায়গাই আমার সব !!”

ধাক্কা খেয়ে আশীষ মলিন মুখে বসে রইল সেই ঘরে। তাকিয়ে থাকে অনিমেষ হয়ে অন্ধকার রাস্তার দিকে।

এমন সময় ফিরে এলো জগু। ডাকলে রাণীকে। “রাণি, ওরাণি, গেলি কোথা মা। কী অন্ধকার রে বাবা, বলি, বাইরের ঘরে একটা আলো দিস্‌নি কেন ? বলেই রাণীর ঘরের সম্মুখ থেকে জলন্ত প্রদীপটা তুলে নিয়ে আশীষ যে ঘরে বসে ছিল সেই ঘরে প্রবেশ করে, প্রদীপটা মাটিতে রাখতে রাখতে আশীষকে লক্ষ্য করে বললে—“ছাখোদেখি

কাণ্ডখানা, তোমায় এতক্ষণ অন্ধকারে বসিয়ে রেখেছে।"

কিছুক্ষণ আগে জগুর অগোচরে যে ঘটনাটা ঘটে গেল, আশীষ তন্ময় হ'য়ে তাহাই ভাবছিল। অকস্মাৎ জগুর কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙলো তার। তাড়াতাড়ি উত্তর করলে "আলোটা হটাৎ নিভে গেছে।"

"ও তাই নাকি" বলে জগু আশীষের দিকে তাকাতেই বলে উঠল সে। "দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার দুটো কথা ছিল।"

"কী কথা, বলো ?"

"—যদি রাগ করেন ?"

"রাগ করবো! —আমি! তোমার উপর ? কেন ? আমাকে যে ভাবিয়ে তুল্লে বাবা! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে।"

আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে লজ্জা ও সঙ্কোচে মুখের কথাটা মুখেই আটকে গেল আশীষের।

তাকে মৌন ও ইতস্ততঃ করতে দেখে বলে ওঠে জগু, "আরে, অত দ্বিধা বা সঙ্কোচের কী আছে ? কথাটা যখন বলতে ইচ্ছে করেছ, তখন খুলেই বলো না ?"

"দেখুন, আপনি ঠিকই বলেছিলেন, আপনার মেয়ের হতভাগা স্বামী একদিন তার ভুল বুঝতে পেরে, আপনার মেয়েকে শেধে নিয়ে যাবে। সত্যি, সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে। পূর্ব্বকৃত কার্য্যের জন্যে সে অনুতপ্ত। আজ আপনার ক্ষমা ও কৃপা প্রার্থী সে।"

"কিন্তু, তাকে তুমি জানলে কি করে ?"

"আমি তাকে চিনি।"

একটু বিদ্রুপের হাসি হাসে জগু। বললে, "চিনবে বইকি! শিক্ষিত যুবক, লেখাপড়া শিখে, সমস্ত লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে, এমন একটা গর্হিত কাজ করে ফেললো, একবার একটু চিন্তা করে দেখলে না! কোথায় তারা সমাজকে গড়ে তুলবে, দেশকে উন্নত করবে, তা—না

করে, বিনা দোষে প্রথমা স্ত্রী সতী সাধ্বীকে দিলে তাড়িয়ে কিনা এক অভিনেত্রীর রূপে মুগ্ধ হয়ে! এই যদি সমাজ গঠনের নমুনা হয়, তা হ'লে এর চাইতে দুঃখের আর পরিতাপের বিষয় কি হ'তে পারে? —আর তবে শিক্ষারই বা মানে কি? —বলতে পার? —তুমি তা হ'লে সত্যি তাকে চেন? —কোথায় থাকে সে হতভাগা?"

লজ্জা ও সঙ্কোচ সজোরে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, ধীরে ধীরে উত্তর করলে আশীষ, "আমায় ক্ষমা করবেন—আমিই সেই হতভাগা—আশীষ, —রাণীর স্বামী।"

পথ চলতে চলতে পায়ের সামনে হঠাৎ সাপ দেখলে পথিক যেমন চমকে ওঠে, আশীষের পরিচয় পেয়ে জগুও ঠিক তেমনিভাবে চমকে উঠলো। আশীষের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে জগু। জ্বলে ওঠে আগুনের মত দপ্‌দপ্‌ করে তার চোখ দুটো। বিস্ময়ে প্রশ্ন করলে সে, "য়্যাঁ! —তুমি—তুমিই—রাণীর স্বামী?"

জগুর মধ্যে যেন একটা প্রলয়ঙ্কর ঝড় বয়ে গেল। এক মুহূর্তে তার কোমল কথাগুলো শক্ত চাবুকের মত হয়ে উঠলো।

"তা কি বলতে চাও তুমি?"

লজ্জা ও অপমানে রাঙ্গা হয়ে ওঠে আশীষের মুখমণ্ডল। অপরাধীর মতো বললে, "রাণীকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।"

"নিতে এসেছ রাণীকে?" আশীষের কথাটাই ব্যঙ্গ করে পুণরুক্তি করলে জগু। "এত নির্দ্দয় ও কঠোর ব্যবহার তার সঙ্গে করেও বুঝি তোমার সখ মেটেনি,—না? তুমি কি রাণীর সম্মান রাখতে পেরেছো?"

"আমি আর ওর অসম্মান করবো না।"

"তোমার কথায় বিশ্বাস কি?"

"আপনার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি। আমায় বিশ্বাস করুণ।"

এই দুনিয়ায় এমন কতগুলো লোক আছে, যাদের স্বভাবই হ'লো পরের উপকার করা, পরের মঙ্গল করা। হাসিমুখে নীরবে সকল দুঃখ কষ্ট বরণ করতে, আপনার সকল সুখ সুবিধা জলাঞ্জলি দিতে এতটুকু কুন্ঠিত বা পশ্চাদ্‌পদ হয় না তারা। শত বাধা বিঘ্ন ঝড় ঝাপটা বাধা দিতে পারে না তাদের সেই সাধনাকে। আর ক্ষমাই তাদের চরিত্রের প্রধান গুণ, যা দিয়ে তারা পাপীকে পাপমুক্ত করে সাধুতে পরিণত করে। সার্থক তাদের জন্ম। ঠিক এই প্রকৃতির লোক ছিল জগু। আশীষের কথায় ও প্রতিশ্রুতিতে তার উপর জগুর রাগ জল হয়ে গেল। তাই ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো সে আশীষের সামনে। বলতে থাকে, "তুমি যে তোমার ভুল বুঝতে পেরে, রাণীকে নিতে এসেছো, এতে আমি খুসী হয়েছি। তবে কি জানো বাবা, রাণী আমার বড়ো অভিমানিনী। তবে এজন্যে ভেবোনা। হাজার হোক, ওরা মায়ের জাত। অভিমান করে কখনও এই শিশুকে ফেলতে পারবে না। তুমি অপেক্ষা কর এখানে, আমি আসছি।"

রাত্রি তখন প্রায় আটটা। রাণী তার ঘরে উপুর হয়ে পড়ে, ফুলে ফুলে কাঁদছে। এমন সময় প্রবেশ করলো জগু। তাকে কাঁদতে দেখে বৃদ্ধের চোখেও কান্নার বান ডেকে উঠলো। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বসলো সে রাণীর পাশটিতে, তার চুলের মধ্যে সে তার বুড়ো বয়সের ফাটা আঙুলগুলো নীরবে বুলিয়ে যেতে লাগলো। জগুর ছোঁয়া পেয়ে রাণীর কান্না আরও উদ্দাম হয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু এই কান্না যত কষ্টের ও যত আরামেরই হোক, তাকে বাধা দিয়ে জগু মুখ নীচু করে বললে, "ওঠ্‌ মা আশীষ এসেছে, যা, তাকে ডেকে নিয়ে আয়। এমনিভাবে সরে থাকলে তো আর চলবে না।"

প্রত্যুত্তরে কিছুই বলতে পারলো না রাণী।

তার মনের অবস্থা বুঝতে পারে জগু। শান্ত কণ্ঠে বলতে থাকে "সবই বুঝি মা। যা হবার তো হয়েই গেছে। এখন পূর্ব্বের সব কিছু ক্ষত তোকে ভুলতে হবে। তুই সতী, সাধ্বী ও বুদ্ধিমতী মেয়ে।" সস্নেহে রাণীর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে আবার বললে জগু, "আশীষ আর সে আশীষ নেই মা। সে একেবারে বদলে গেছে। জীবনে সেও অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে। কেবল তোর দুঃখটাই বড় করে দেখছিস্?—একবার আশীষের অবস্থাটাও ভেবে ছাখ্। সেও কি কোনদিন শান্তি পেয়েছে? —সুখী হতে পেরেছে? —পারেনি। লোকে কথায় বলে স্বামীর ঘর। সেই ঘরে তুই আবার হাসিমুখে ফিরে যা, মা। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি এতে তোর আর দাদুর ভালই হ'বে।"

জগুর কথায় রাণীর চোখ দিয়ে পূর্ব্ববৎ ঝরঝর করে জল পড়তে লাগলো। বললে, "কিন্তু আমি যে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি বাবা!"

"তাড়িয়ে দিলেই কি সে চলে যেতে পারে, তার স্ত্রী আর ছেলেকে ফেলে? —বাইরে সে অপেক্ষা করছে, আকুলভাবে—তোরই একটা মুখের কথার জন্যে। আয়—মা—আয়," বলে জগু রাণীকে একরকম ধরেই নিয়ে এলো বাইরের ঘরে।

মাথায় আঁচলটা একটু টেনে দেয় রাণী। চোখ দুটী তার তখনও জলে ভরা। কম্পিত বক্ষে দাঁড়িয়ে থাকে সে জগুর পাশে।

বললে ছল্‌ছল্ নয়নে জগু, "বুকে তুলে নে মা ঐ শিশুকে। ওর মা নেই। এতদিন তুই এক ছেলের মা ছিলি, আজ থেকে তোর দুই ছেলে।" বলেই জগু দু'হাত বাড়িয়ে বাবুলকে রাণীর হাতে তুলে দিতে গেল। কিন্তু বাবুল নড়লো না। জগুর হাত থেকে একটা হেঁচকা টান দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে, যেখানে আশীষ দাঁড়িয়েছিল, সেইখানে সরে গিয়ে দাঁড়ালো আশীষের গা ঘেঁষে। খানিক পরেই সে আশীষের

দু'হাত ধরে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে কাঁদ কাঁদ স্বরে বললে, "তুমি না বলেছিলে, আমায় মার কাছে নিয়ে যাবে, কোথায় আমার মা ? —বলো না বাবা ?"

নিশ্চলভাবে বাবুলের দিকে তাকিয়ে থাকে আশীষ। তারপর আঙুল দিয়ে রাণীকে দেখিয়ে বললে, "ঐতো, ঐ তোর মা!"

আশীষের কথায় বাবুল তার হাত ছেড়ে দিয়ে ছুটে যায় রাণীর কাছে। রাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত বালকটির মতো কি যেন দেখল বাবুল। হয়তো বা রাণীর মুখখানার মধ্যে দেখতে পেল সে তার হারানো মায়ের প্রতিচ্ছবি। পরক্ষণেই সুধামাখা মধুঢালা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে রাণীকে, "সত্যি, তুমি আমার মা ?"

অভিমান করে থাকতে পারে না রাণী। মাতৃহারা শিশুটির উপর মমতায় তার প্রাণ ভরে উঠলো। দুহাত বাড়িয়ে সযত্নে কোলে তুলে নিলে তাকে। সজোরে বুকে চেপে ধরে বললে, "হ্যাঁ বাবা, আমিই তোমার মা।"

"সত্যি ?" আনন্দে আবার জিজ্ঞাসা করলে বাবুল।

"হ্যাঁ, বাবা, সত্যি-ই আমি তোমার মা।" দু'চোখ দিয়ে সমানে জল ঝরতে থাকে রাণীর।

মনের মত জবাব পেয়ে আনন্দে রাণীর গলা দুহাতে জড়িয়ে ধরে বাবুল!

ঠিক এমনি সময় 'দাদু দাদু' বলে খোকন ফিরে এলো রাধা-কৃষ্ণের মন্দির থেকে। খোকনের গলার স্বর পেয়ে ছুটে এলো জগু।

"দাদু, রাধা-কৃষ্ণের আরতি দেখে এলাম। ঠাকুরকে প্রণাম করে কি বলেছি, জানো ? —বলেছি, ঠাকুর, আমায় শীগ্‌গির বড়ো করে দাও। তা হ'লেই শীগগির বাবার কাছে যেতে পারবো।"

খোকনের কথায় দু'চোখ ছাপিয়ে জল এল জগুর! সে জল আজ দুঃখের নয়, বড়ো আনন্দের! চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললে

জগু, "ওরে দাদু, আয়—আয় এখানে। দেখবি কে এসেছে। ঠাকুর তোর ডাক্ শুনেছেন রে, তোর ডাক শুনেছেন! অনেক দূর থেকে তোর বাবা ফিরে এসেছে!"

"কোথায়—কোথায় দাদু?" সাগ্রহে বললে খোকন।

অপরাধীর মত্তো এগিয়ে এলো আশীষ। কোলে তুলে নিল খোকনকে। তাকিয়ে থাকে খোকন আশীষের মুখের দিকে। বললে, "সেই তুমি?" বলেই সে তার চঞ্চল চাউনি দিয়ে ঘরের চারিদিকে খুঁজতে থাকে তার বাবাকে। পরক্ষণে জগুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "বাবা এসেছে? কই আমার বাবা?"

পারলে না আশীষ খোকনের কাছে পরিচয় দিতে। শুধু তার চোখ দুটি সহসা ভরে উঠলো জলে। পরিচয় দিলে জগু, "ওরে এইতো তোর বাবা—যার কোলে উঠেছিস্।"

"তুমি! তুমি আমার বাবা?" বলে আশীষের মুখের দিকে তাকাতেই কি যেন প্রশ্ন জাগে খোকনের শিশু মনে। হঠাৎ বলে উঠল খোকন, "কৈ সেবার যখন তুমি এসেছিলে, তখন কেন বলোনি, তুমি আমার বাবা? বলোনা, সত্যি তুমি আমার বাবা?"

বহুকাল পরে আপন সন্তানকে বুকের মধ্যে পেয়ে আশীষও যেন কেমন ধারা হয়ে গেছে। অনুতপ্ত অশ্রুর বিরাট উৎস প্রবাহের পথ না পেয়ে আটকিয়ে দেয় তার কণ্ঠস্বর। সে শুধু বলতে পারে হ্যাঁ, খোকন সত্যি!"

সঙ্গে যোগ দিলে জগু, "খোকন তোর বাবাটা ভারী দুষ্টু। পাছে তুই সেই অনেক দূর যেতে চাস, সেইজন্যে তোকে বলেনি, আমাকেও বলতে দেয়নি। তোর দুষ্টু বাবাকে আর কখনও ছাড়বিনে।"

"হুঁ ছাড়বো, আর ছাড়বোনা! কখনও ছাড়বোনা!" বলে খোকন আশীষের গলাটা দুহাত দিয়ে সজোরে আকরিয়ে ধরলো।

আশীষ চেয়ে দেখে শাশ্রুনয়নে, বুঝিবা অনুতপ্ত হৃদয়ে ব্যাকুল ভাবে চেয়ে আছে রাণী তারই দিকে। মমতা-মাখা এ চাহনি। পরক্ষণেই আশীষ ও রাণী একসঙ্গে ভূমিষ্ট হয়ে জগুকে প্রণাম করলে।

বৃদ্ধ জগুর চোখে আজ মাটির ঘরে স্বর্গ নেমে এলো। সানন্দে দুজনের মাথায় দুহাত রেখে প্রাণভরে সে তাদের আশীর্ব্বাদ করলো।

সমাপ্ত